শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
তরুণ-সাহিত্য-মন্দির

উপহার
তরুণ-সাহিত্য-মন্দির

আমাদের দ্বিতীয় শিশুগ্রন্থ

— অঙ্গরাগ —

কথা—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

নাম—শ্রীব্রজমোহন দাশ

শিল্পী—শ্রীবিজয় রায়চৌধুরী

ব্লক—ন্যাশানাল হাফটোন কোং

❀

—পরিকল্পনা—

প্রকাশ ও প্রচার-পন্থা

শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

—

স্বত্বাধিকারী—

শ্রীকিরীটিকুমার পাল

আশীর্ব্বাদ করুন !

কৈশোরে পাঠ্যাবস্থায় এই সাহিত্য-প্রচার-ব্রত গ্রহণের একটা মর্ম্মান্তিক কৈফিয়ৎ আছে, সে-ব্যথার কথা পরে জানাবো সিদ্ধিলাভ কোরে। মোট কথা এ আমার সাহিত্যের বেসাতী নয়—বংশানুক্রমিক সাধনা।

আজীবন নূতন প্রণালীতে সাহিত্য-প্রচারে অগ্রগামী পূজ্যপাদ পিতৃদেব শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পাল নির্দ্দেশিত পথাবলম্বনে—আমাদের সাহিত্য-যজ্ঞের হোতা, লোকবিশ্রুত গীতিকবি ও সুসাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাশ মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ কোরে সাহিত্য-সাধনার আসনে উপবিষ্ট হবার আগে, গুণগ্রাহী সাহিত্যামোদী সজ্জনবৃন্দের কাছে অনুমতি অপেক্ষায় এই দেখুন, যুক্তকর—নতশির।

আশীর্ব্বাদপ্রার্থী—

শ্রীকিরীটিকুমার পাল

সূচীপত্র

না বোললেই বা জানবে কেমন কোরে!

বেশ শান্তভাবে শোনো। ছোটদের জন্যে তোমাদের 'তরুণ-সাহিত্য-মন্দির' থেকে যে-সব বই বেরোবে তার প্রত্যেক-খানিতেই একখানি কোরে 'কুপন' থাকবে, যে 'কুপন' জমা দিলে তোমরা পুরস্কার পাবে। এখন কেন্‌বার তাড়াতাড়িতে না-দেখে যদি তোমরা 'কুপন'-ছাড়া বই কেনো, তাহলে সে দোষ কার হবে? বই কেনার পর 'কুপন' না-পাওয়ার অভিযোগ কোরলে আমরা কিন্তু দায়ী হবোনা—বুঝলে?

আনন্দময়ীর আগমনে

আশ্বিন মাস। বর্ষা শেষ হইয়াছে। মাথার উপরে শরতের নীল নির্মেঘ পরিচ্ছন্ন আকাশ! নিম্নে দিগন্তবিস্তৃত ঘনশ্যাম শস্যক্ষেত্র। বাঙ্গালীর ঘরে-ঘরে শারদীয় উৎসব, মনে-মনে আনন্দের উদ্বেগ!

শিউলী ফুলের মিষ্টি গন্ধে গ্রাম-পথ আমোদিত হইয়া গেছে। বসন্ত নয়, তবু যখন-তখন আগন্তুক

কোকিলের ডাক শোনা যায়। ভুলিয়া হয়ত' তাহারা শরৎকে বসন্ত ভাবিয়া ডাকিয়া ওঠে। আবার তৎক্ষণাৎ তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়া থামিয়া যায়।

কয়লাকুঠির দেশ। কিছুদিন আগে আশ-পাশের কয়লা-কুঠিগুলা যখন পুরাদমে চলিত, সাহেব-সুবার বন্দুকের ভয়ে পাখীগুলা তখন কোথায় যে পালাইয়াছিল কে জানে, এ-অঞ্চলে কাক ছাড়া আর পাখী দেখা যাইত না, আজকাল আবার নানা রং-বেরঙের পাখীর আমদানি হইয়াছে।

নিদ্রালস মধ্যাহ্ন-বেলায় সমস্ত গ্রাম যখন রৌদ্রের তাতে নিঝ্‌ঝুম হইয়া আসে, দূর-দূরান্তের কোথায় কোন্ প্রান্তরের প্রান্ত হইতে ঘুঘুর ডাক শোনা যায়। এদিকে নর-ঘুঘুর ডাক থামিতে না থামিতেই ওদিকে নারী-ঘুঘুর ডাক সুরু হয়। এমনি করিয়া ডাকের জবাব দিতে দিতে সারা দুপুরটা তাহারা জোড়ায় জোড়ায় উড়িয়া বেড়ায়।

এমনি দিনে বাসন্তীপুরের বাবুদের বাড়ীতে দুর্গাপূজার উৎসব। এই উৎসব উপলক্ষে ইহার আগের বৎসরেও ধুমধামের অন্ত ছিল না। কলিকাতা হইতে বড় দলের যাত্রা আসিয়াছিল, রাস্তার দু'ধারে বাজার বসিয়াছিল, রাত্রে বাজি পুড়িয়াছিল, আর আহারাদির বিরাট বন্দোবস্ত,—সে ত' ছিলই। বাবুদের বৈঠকখানা বাড়ীতে একবার ঢুকিলেই হইল। তা সে যে-ই হও,

স্বদেশী বিদেশী, আত্মীয় কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ শূদ্র, অপহৃতা অসুরা,—কিছুতেই কিছু আসে যায় না। একই লোক বার-বার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে কিনা সেইটুকু যদি লুকাইতে পারিয়াছ ত' বাস্, আর কোনও চিন্তা নাই। দরজায় দু'দুটা চাকর মতায়েন্ আছে, মহা-সমাদরে তৎক্ষণাৎ তোমাকে ডাকিয়া বসাইবে, আসন ও পাতা পাতাই আছে, পেট ভরিয়া খাও, আর চলিয়া যাও,—কেহ একটি কথাও বলিবে না।

বছর-পাঁচেক আগে বন্দোবস্তটা একটু ভিন্ন রকমের ছিল। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোনও জাতি সেখানে প্রবেশ করিতে পারিত না। তবে খাবার লোভ বড় লোভ। গলায় সাদা সুতার কয়েকগাছি পৈতা ঝুলাইয়া দূর-দূরান্তের দু'চার জন অপরিচিত শূদ্রও যে সেখানে লুকাইয়া প্রবেশ করিত না তাহা নহে। কিন্তু সে-বৎসর এমনি একজন পৈতাধারী ভণ্ড ধরা পড়িল। এবং ধরা পড়িয়া এত মার সে খাইল যে, সে-কথা আর বলিবার নয়। বেচারা কাঁদিতে কাঁদিতে পালাইবার আর পথ পায় না! দোতলার জানালা হইতে গিন্নি-মা সে দৃশ্য দেখিলেন। তৎক্ষণাৎ হুকুম হইল উহাকে গিন্নি-মার কাছে লইয়া যাইতে হইবে। লোকটা ভাবিল, এইখানেই যদি মারের চোটে সর্ব্বাঙ্গে তাহার ব্যথা ধরাইয়া দিতে পারে, ত' না-জানি তে-মহলা ওই বাড়ীর ভিতর লইয়া গিয়া তাহাকে একেবারে প্রাণে মারিয়া ফেলিবে

কিনা তাই-বা কে জানে! সেই ভয়ে লোকটা মরি-বাঁচি করিয়া লোকজনের ভিড়ের মাঝখান দিয়া—দে দৌড়! দৌড়িয়া কোথায় যে সে পালাইয়া গিয়া দম লইল কে জানে।

সেই দিনই গভীর রাত্রে গিন্নি-মা স্বপ্ন দেখিলেন।

দেখিলেন, শতচ্ছিন্ন একখানি মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া কে যেন এক ভিখারিণী বালিকা তাঁহার সুমুখে ভিক্ষাপাত্র প্রসারিত করিয়া বলিল, 'অনেকদিন কিছু খেতে পাইনি মা, চারটি খেতে দাও।'

গিন্নি-মা বলিলেন 'সে কি! আমার বা'র-বাড়ীতে এত-এত খাবার আয়োজন! আর তুমি খেতে পাওনি? দাঁড়াও, আমি দেওয়ানকে ডেকে বলে দিচ্ছি।'

ভিখারিণী ভয়ে সন্ত্রস্তা হইয়া উঠিল। বলিল, 'না মা, দেওয়ানকে ডাকবেন না। প্রতি বৎসর আমি এই পূজোর সময় আসি, আর প্রতি বৎসর ওরা আমায় মেরে-মেরে তাড়িয়ে দেয়, আমি কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যাই। পেটের ক্ষিদের কথা আর লজ্জায় মুখ ফুটে কাউকে বলতে পর্য্যন্ত পারি না।'

গিন্নি-মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন?'

ভিখারিণী বলিল, 'আমি যে ব্রাহ্মণ নই মা!'

'তুমি কি?'

'আমি কি, তা ত' তুমি দেখতেই পাচ্ছ মা! আমি ভিখারিণী!'—মেয়েটির চোখ দুইটি ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। বলিল, 'এমন অবস্থা আমার ছিল না মা, আমি রাজার মেয়ে। ডাকাতে আমার বাবা-মাকে খুন করেছে, রাজ্য নিয়েছে, সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে পথের ভিখারিণী করে' ছেড়ে দিয়েছে।'

'চল, আমি তোমাকে খেতে দেবো চল!'

এই বলিয়া গিন্নি-মা তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিলেন।

মেয়েটি বলিল, 'তুমি হাত ধরলে কেন মা, আমি ত' ব্রাহ্মণ নই!'

'নাই-বা হ'লে ব্রাহ্মণ, ক্ষুধার্ত্ত ত'?'

'ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান তুমি ত' কর না মা, তুমি কর ব্রাহ্মণকে।'

এই বলিয়া মেয়েটি ছুটিয়া পালাইল। গিন্নি-মাও পিছু পিছু ছুটিলেন। মেয়েটি সরাসর ঢুকিল গিয়া পূজা-মন্দিরে।

গিন্নি-মাও ঢুকিলেন।—'তুমি কোথায়? তুমি কোথায় ভিখারিণী?'

তাঁহার এই ব্যাকুল আহ্বান মন্দিরের খিলানে-খিলানে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল,—'তুমি কোথায়, তুমি কোথায় ভিখারিণী?'

ভিখারিণীকে দেখিতে পাওয়া গেল না, কিন্তু সহসা মনে হইল কে যেন খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে।

হাসির শব্দে তিনি মুখ তুলিয়া তাকাইলেন। বিস্ময়ে পুলকিতনেত্রে চাহিয়া দেখিলেন—দশপ্রহরণ-ধারিণী জগজ্জননী শঙ্করীর মৃৎ-প্রতিমা সহসা যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এ হাসি তাঁহারই হাসি!

সর্ব্বশরীর তাঁহার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া তিনি প্রতিমার চরণ স্পর্শ করিতে গেলেন, কিন্তু অসুরের ঢালে তাঁহার হাত আট্‌কাইয়া যাইতেই তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।
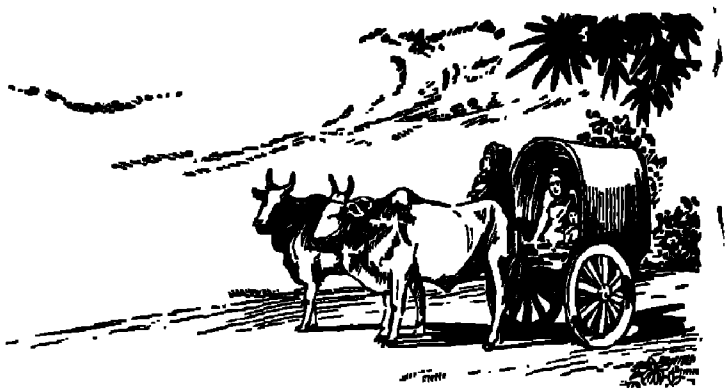
বৌর চোখের জল

তেপান্তরের মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড দোতলা ওই বাড়ীটা,—দেখলেই মনে হয় ভূতুড়ে বাড়ী। বাড়ীর মালিক যে কেন এখানে বাড়ী তৈরি করেছিলেন কে জানে। বাড়ীর চারিদিকে ছোট একটি বাগান তৈরি করবার জন্যে বাড়ীর মালিক এক সময় বোধহয় নানারকম গাছের চারা পুঁতেছিলেন; সে-সব গাছ এখন এক-একটি বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। রাত্রির অন্ধকারে জনমানবহীন এই প্রান্তরের মাঝখানে হঠাৎ যদি কোনদিন ঝড় ওঠে ত ভারি মজা হয়। এই বাড়ীতে এর আগে যাঁরা বাস করে গেছেন, দোতলার একটা ঘরের পশ্চিমদিকের একটা জানলা তাঁরা বন্ধ করেন নি, এখনও সেটা তেমনি

খোলাই আছে ; ঝড় উঠলে খোলা এই জানলার কপাটত্নটো দড়াম্ দড়াম্ ক'রে একবার খোলে একবার বন্ধ হয়, গাছের পাতায় পাতায় ঝড়ের বাতাস লেগে সর্ সর্ ক'রে কেমন যেন একটা একটানা আওয়াজ হ'তে থাকে, কোথায় যেন একটা গাছের ডাল মাঝে মাঝে মড়্ মড়্ করে ওঠে।

এই নিয়ে কত লোক যে কত কথা বলে তার অন্ত নেই। কেউ বলে এই বাড়ীতে ভূত তারা স্বচক্ষে দেখেছে, কেউ বলে প্রায় প্রত্যহ রাত্রেই এ-বাড়ীতে আলো জ্বলতে দেখা যায়, কেউ বলে এই বাড়ীর পাশ দিয়ে দিনের বেলা পার হয়ে গেলেও গা ছম্-ছম্ করে। মোট কথা, ভূত যে এ-বাড়ীতে আছে তাতে আর কোন সন্দেহই নেই।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই বাড়ীর মালিকের খেয়াল। এখান থেকে শহরে যেতে হ'লে এক ক্রোশ পথ হাঁটতে হয়। ট্রেন ধরতে হ'লেও তাই। মানুষের মুখ দেখতে হ'লে—হয় শহরে যেতে হয়, আর নইলে পশ্চিমদিকে মাইল-দেড়েক পথ হেঁটে গেলে শাল-মহুয়ার জঙ্গলের মাঝখানে সাঁওতালদের ছোট-ছোট গ্রাম দেখা যায়।

কাজেই এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে এমন একখানি সুন্দর বাড়ী তৈরি করার কোনও মানেই হয় না। তবে সান্ত্বনার মধ্যে এই যে জায়গাটা বড় স্বাস্থ্যকর। সাঁওতাল-পরগণার

মাটি, চারিদিকে শাল, মহুয়া, তাল আর তমালের গাছ, অসমতল ঢেউ-খেলানো রাঙা মাটির প্রান্তর, আর তারই মাঝে-মাঝে খালের মত ছোট ছোট এক-একটি নদী সাপের মত এঁকে-বেঁকে কোথায় কোন্‌দিকে যে চলে গেছে কে জানে। বছরের অধিকাংশ সময়েই এই সব খালে থাকে শুক্‌নো সাদা বালি, বর্ষার কয়েকটামাস শুধু ঘোলাটে জলে এই সব খাল কানায় কানায় থৈ থৈ করে, পশ্চিমের কোন্‌-একটা পাহাড় থেকে নাকি গিরি-মাটির ঢল্‌ নামে।

যাই হোক, এই বাড়ীখানি তৈরি করবার ইতিহাস আমরা শুনেছি। বাড়ীর মালিক নগেন চৌধুরী অনেকদিন আগেই মারা গেছেন। এখন তাঁর দুই নাতি রয়েছে বেঁচে। নগেনবাবু ছিলেন গরীবের ছেলে। কলকাতা শহরে অতি কষ্টে তাঁদের দিন চলতো। নগেনবাবু কিন্তু নিজের চেষ্টায় শিমুল তুলো আর হরীতকীর ব্যবসা করে' বড়লোক হন্‌। এই দুটো জিনিষের জন্যে প্রায়ই তাঁকে এ-অঞ্চলে আসতে হ'তো। এসে তিনি প্রায়ই এই কাঞ্চিপুর শহরেই উঠতেন। উঠতেন বিনয় গোস্বামী ব'লে এক ভদ্রলোকের বাসায়। এই বিনয়বাবু জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে-ঘুরে তাঁর জন্যে হরীতকী সংগ্রহ করতেন।

হঠাৎ একদিন বিনয়বাবুর হ'লো কিছু টাকার দরকার। নগেনবাবু তাঁকে পঁচিশটি টাকা ধার দিলেন।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে-টাকা তিনি আর শোধ করতে পারলেন না। থাকবার মধ্যে ছিল তাঁর ওই ফাঁকা মাঠের ওপর একটুখানি জমি। ভেবেছিলেন তাঁর মেজ মেয়েকে ওই জমিটুকু তিনি দান করবেন। কারণ আর-সব মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন ভাল ঘর দেখে, শুধু মেজ মেয়েটাই কষ্টে পড়েছে। বেচারার কিছু নেই।

তা আর হয়ে উঠলো না। নগেনবাবু ক্রমাগত টাকার তাগাদা করতে লাগলেন। কলকাতা থেকে চিঠি লিখলেন—তোমার হ্যাণ্ডনোটের মেয়াদ প্রায় তিন বছর হ'তে চললো। সুদে আসলে তোমার ঋণের টাকা পরিশোধ করবার ব্যবস্থা যদি না কর ত' বাধ্য হয়ে আমায় নালিশ করতে হবে।

বিনয়বাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে বসে ভাবতে লাগলেন। শরীর তাঁর অত্যন্ত অসুস্থ, কবে মারা যান কে জানে। মরবার আগে কোনরকমের ঋণ তিনি রেখে যেতে চান না। তবে নগেনবাবু ইচ্ছে করলে এই সামান্য টাকার ঋণ থেকে তাঁকে রেহাই দিতে পারতেন। দেওয়া বোধহয় উচিত ছিল। কারণ রোদ্দুর নেই, বৃষ্টি নেই, দিবারাত্রি তিনি বহু দূরের জঙ্গলে-জঙ্গলে গ্রামে-গ্রামে ঘুরে-ঘুরে হরীতকী সংগ্রহ করেছেন, এবং তাঁর জন্যে তিনি নিজে পেয়েছেন মাত্র পনেরোটি টাকা মাইনে, আর নগেনবাবু পেয়েছেন হাজার হাজার টাকা লাভ।

তা পান, তাতে তার হিংসে করবার কিছু নেই, তিনি চেয়েছিলেন মাত্র এই পঁচিশটি টাকার ঋণ থেকে মুক্তি।

কিন্তু তা তিনি পেলেন না। হ্যাণ্ডনোটের তামাদি হবার সময় যতই ঘনিয়ে আসতে থাকে, নগেনবাবুর তাগাদা ততই যেন বাড়ে। চিঠির পর চিঠি, লোকের পর লোক, শেষে একদিন নিজে এসে হাজির হলেন।

বিনয়বাবু বললেন, নগদ টাকা আমার হাতে থাকলে আপনার এ ঋণ রাখতাম না, এখন কি করি তাই ভাবছি।

নগেনবাবু বললেন, ভাবতে ভাবতে হ্যাণ্ডনোটের মেয়াদ যে ফুরিয়ে গেল। বিনয়বাবু বললেন, আমার থাকবার মধ্যে আছে শুধু ওই ফাঁকা ডাঙ্গার মধ্যে একটুখানি

জায়গা। ভেবেছিলাম ও জায়গাটুকু আমার মেজ মেয়েটাকে দেবো, বেচারার বাড়ী-ঘর-দোর কিছু নেই, বড় কষ্টে দিন চলে। আপনাকে দিতে হ'লে ওইটুকুই দিতে হয়।

নগেনবাবু বললেন, তাই দাও।

বিনয়বাবু বললেন, কিন্তু ওর দাম—

নগেনবাবু সে কথাটা তাঁর হেসেই উড়িয়ে দিলেন। বললেন, পাগল হয়েছ? তোমার ও জমির কি—দাম আছে নাকি?—ওখানে শুক্‌নো ওই কাঁকর-পাথরের ডাঙ্গার মধ্যে জমি নিয়ে মানুষ করবে কি?

এমনি-সব নানান্ কথা বলে জমিটুকু নগেনবাবু তাঁর কাছ থেকে লিখিয়ে নিলেন। কথা রইলো, ওখানে বাড়ী যখন তিনি তৈরি করবেন, বিনয়বাবুর মেজ মেয়েকে তখন কিছু টাকা দেবেন।

বিনয়বাবু ঝর্ ঝর্ ক'রে কেঁদে ফেললেন। নগেনবাবুর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন, দেখবেন সার্, দেবেন যেন। মেয়েটার আমার কিচ্ছু নেই।

নগেনবাবু প্রতিশ্রুত হলেন।

** ** **

তারপরেই বিনয়বাবু গেলেন মরে।

জায়গাটা এতদিন এমনিই পড়ে ছিল। নগেনবাবু

ভেবেছিলেন, শহরটা নিশ্চয়ই এইদিকপানে এগিয়ে আসবে, তখন তিনি কারও কাছ থেকে বেশ একটা মোটা রকমের দাঁও মেরে নিয়ে জায়গাটা দেবেন বেচে।

কিন্তু সে সুবিধা তিনি আর পেলেন না। শহরটা এগিয়ে আসতে আসতে খালের মত ছোট্ট ওই নদীটার কিনারে এসেই থমকে থাম্‌লো। সেই যে থাম্‌লো, সেইখানেই গেল তার গতি রুদ্ধ হয়ে। তার কারণ—বর্ষা কয়েকমাস এতটুকু ওই নদীর চেহারা হয় বড় ভয়ঙ্কর, জলের তোড়ে কারও সাধ্য থাকে না যে পার হয়ে ওপারে যায়। একবার একটা গরু নাকি পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হ'য়ে জল খাবার জন্যে মনের ভুলে ওইখানে গিয়ে নেমেছিল। বাস্‌—নিমেষের মধ্যে তাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। স্রোতের জল কোথায় যে তাকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে ফেললে কে জানে!

নগেনবাবু তখন এক বুদ্ধি ঠাওরালেন। সর্ব্বপ্রথম ওই খালের ওপর বাঁধলেন লোহা দিয়ে এক চমৎকার পুল। তারপর আরম্ভ করলেন বিনয়বাবুর-দেওয়া সেই জায়গাটার ওপর প্রকাণ্ড এক বাড়ী।

দেখতে দেখতে খুব সুন্দর একখানি বাড়ী তৈরি হয়ে গেল।

বিনয়বাবুর মেজ মেয়ে একদিন তার কোলের ছেলেটিকে সঙ্গে

নিয়ে ধীরে-ধীরে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, জ্যাঠা-মশাই, বাড়ী তৈরি করবার সময় আমায় কিছু দেবেন বলেছিলেন, তাই এসেছি।

নগেনবাবু বললেন, কখন বলেছিলাম? কি বলেছিলাম?

কোনও কথাই তার মনে পড়ল না। ঘাড় নেড়ে বললেন, না। এ সময়ে এই বাড়ীটা তৈরি করতে এত-এত টাকা আমার খরচ হয়ে গেল, এখন আমি কাউকে কিছু দিতে পারব না।

মেয়েটা বড় আশায় এসেছিল। বললে, দিলে আমার বড় উপকার করা হ'তো জ্যাঠামশাই, বড় বিপদে পড়েই আমি এসেছিলাম আপনার কাছে।

বলতে গিয়ে চোখদুটো তার জলে ভরে এলো। নগেন-বাবুর দয়া কিছুতেই হলো না। বললেন, দান-খয়রাৎ করতে হ'লে তোমার মতন এমন অনেক আছে সুশীলা। এখানে তুমি মিছেই এসেছ। কিছু পাবে না।

সুশীলা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যাচ্ছিল, নগেনবাবু তাকে ডেকে বললেন, কষ্ট ক'রে এসেছ যখন, তখন তোমার গাড়ী-ভাড়ার দরুণ এই একটি টাকা আমি দিতে পারি, নিয়ে যাও।

সুশীলার পায়ের কাছে টাকাটা তিনি ছুঁড়ে দিলেন।

সুশীলার কাছে এখন একটি টাকার দামও বড় কম নয়। তা সত্ত্বেও টাকাটা সে নগেনবাবুর গায়ের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যেমন এসেছিল তেমনি আবার চলে গেল। একটা কথাও তার মুখ দিয়ে বেরুল না।

** ** **

এ হেন জায়গায় এই ত' গেল নগেনবাবুর বাড়ী তৈরির ইতিহাস।

সুশীলা সেদিন আর তার শ্বশুরবাড়ীতে ফিরে যেতে পারলে না। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ। তখনও এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে নি। পায়ের তলার মাটি তেতে একেবারে আগুন হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যেবেলা শাল-মহুয়ার জঙ্গল থেকে যখন দখিনা বাতাস বইতে থাকে তখন যেন একটুখানি ঠাণ্ডা হয়, তার আগে সারাটা দিন এই দারুণ গরমের মধ্যে মানুষগুলো ছট্‌ফট্ করে। সুশীলা ভাবলে, সন্ধ্যার পরেই সে এখান থেকে রওনা হবে। শ্বশুরবাড়ী অবশ্য তার বেশী দূরে নয়, কিন্তু যত কাছেই হোক, চারিদিকে আগুনের হল্‌কা বইছে, এ অবস্থায় ছোট্ট এই ছেলেটিকে কোলে নিয়ে পথ হাঁটা তার পক্ষে অসম্ভব।

সুশীলা কাঞ্চিপুরেই ফিরে এলো তার ভাইয়ের কাছে। একটিমাত্র ভাই সরোজ। বিনয়বাবুর ওই এক ছেলে। কাঞ্চিপুরেই কোন্ একটা মাড়োয়ারীর গদিতে চাকরি করে।

তেরোটি টাকা মাইনে পায়। সংসার তার তাইতেই চলে। বোনেরা শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে তাই রক্ষে, নইলে চলতো কি না সন্দেহ।

সুশীলা ফিরে আসতেই জিজ্ঞাসা করলে, দিলেন কিছু?

সুশীলার মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না। ঘাড় নেড়ে জানালে—না।

দিলেন না? কি বললেন?

পিপাসায় তখন তার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। বললে, দাঁড়া, বলছি। এক গ্লাস জল খাই আগে।

জল খেয়ে সুশীলা যা বললে, শুনে সরোজের ভারি রাগ হ'লো। বললে, একদম অস্বীকার ক'রে বসলো? বললে কিছু দেবার কথা ছিল না? আচ্ছা মানুষ ত'?

সুশীলা বললে, মরবার সময় পর্য্যন্ত বাবা তার এত ক'রে গেল, আর সেই লোকটাকে পঁচিশটি টাকা সে ছেড়ে দিতে পারলে না! কেমন লোক এইখানেই বুঝে ছাখ্।

সরোজ ব[illegible] আমাদের ঐ জায়গাটার দাম অনেক বেশী। আমরা খদ্দের পেলাম না তাই, তা নইলে—

দুজনেই খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো।

সরোজ বললে, আমি একবার যাই মেজদি, দেখি ও কি বলে।

সুশীলা হাত নেড়ে বললে, না, যাস্‌নে সরোজ, আমি মেয়েমানুষ, আমি নিজে গেলাম, আমাকেই যখন জবাব দিলে, তোকে ত' তখন দেবেই।

সরোজ বললে, কিন্তু এতে ওর ভাল হবে না, এই আমি বলে রাখলাম মেজ্‌দি।

সুশীলা তার ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান একটুখানি হেসে শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

সেই দিনই সন্ধ্যার সময় সুশীলা যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'লো। এখান থেকে ক্রোশখানেক দূরে কস্‌বায় তার শ্বশুরবাড়ী। আজ তাকে সেখানে যেতেই হবে—তা সে যত রাত্রিই হোক্। সেখানে তার শ্বশুরবাড়ী, ননদ দেওর কেউ নেই, আছে মাত্র তার স্বামী। তিনটি ছেলে। দুটি বাড়ীতে আছে, আর এই একটি তার কোলে। সেখানে তাকে যেতে হবে শুধু এই জন্যে যে, স্বামী তার অসুস্থ, প্রায় একটি বৎসর হ'তে চললো সে শয্যাশায়ী। লাঠি ধরে উঠে-হেঁটে চলে-ফিরে বেড়ায় বটে, কিন্তু সে নামমাত্র, বাঁচবার আশা এখনও তার নেই। বিয়ে যখন তার হয়েছিল, স্বামী তখন একটা লোহার কারখানায় চাকরি করছে। আশী টাকা মাইনে, দেখতে শুনতে চমৎকার। কাজেই বিনয়বাবু অন্যায় কিছু করেন নি। কিন্তু সুশীলার

বোধকরি কপাল মন্দ। লোহার কারখানায় চাকরি করতে করতে হঠাৎ একদিন এক অঘটন ঘটে গেল। কারখানার কুলি-মজুরেরা ধর্ম্মঘট ক'রে কাজে এলো না। কোম্পানীর লোকসান হ'তে লাগলো। সুশীলার স্বামী উমানাথ ছিল বড়বাবু। সাহেব বললেন, তুমি ছাখো উমানাথ, কিছু করতে পার কি-না। উমানাথ তখন সাহেবের ডান হাত। খাতিরও যত, প্রতাপও তত! তৎক্ষণাৎ বেরুলো একটা চাবুক হাতে নিয়ে। কুলি-ব্যারাকে গিয়ে দেখে, তারা তখন মদ খেয়ে হাল্লা করছে। উমানাথ প্রথমে তাদের মিষ্টি কথায় বোঝাতে চাইলে। কিন্তু তাদের ধারণা—এই উমানাথের জন্যেই মাইনে তাদের বাড়ছে না। একজন সর্দ্দার মত্ত অবস্থায় তার কাছে এগিয়ে এসে বললে, আমাদের মাইনে বাড়িয়ে দে, আমরা কাজে যাচ্ছি। উমানাথ বললে, চল্ আগে, তার পর দেখা যাবে। সর্দ্দার বললে, কিছুতেই যাব না, টাকা আগে আন্ এইখানে, আমরা দেখি, তার পর যাব। উমানাথ তার জবাবে চড়া গলায় কি যেন বল্‌তেই মাতাল সর্দ্দারটা তার গালে মেরে বসলো এক চড়! উমানাথ এলোপাথাড়ি চালালে তার হাতের চাবুক। উন্মত্ত জনতা গেল ক্ষেপে। উমানাথকে তারা এমন মার মারলে যে সে সেইখানেই অচেতন হ'য়ে পড়ে রইলো। খবর পেয়ে সাহেব নিজে গেল দেখতে।

শেষ পর্য্যন্ত সেই সবই হ'লো, ধর্ম্মঘট যারা করেছিল তাদের মাইনেও বাড়লো, তারা কাজেও গেল, মাঝখান থেকে উমানাথ রইলো হাঁসপাতালে। বাঁচবার কোনও আশাই তার ছিল না। শেষে তিন মাস পরে মাত্র প্রাণটুকু নিয়ে সে হাঁসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলো। সেই তারই জের এখনও চলছে। এখনও সে সেরে উঠতে পারে নি।

হাঁসপাতালে যতদিন সে ছিল, কোম্পানী তার বাড়ীতে মাসে-মাসে পঞ্চাশটি ক'রে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু হাঁসপাতাল থেকে বেরোবার পর কোম্পানী সে টাকা দিলে বন্ধ ক'রে।

উমানাথ বড়-সাহেবের সঙ্গে দেখা করলে। সাহেব বললে, টাকা ত আমার নয় বাবু, টাকা লিমিটেড-কোম্পানীর। আচ্ছা দেখি, আমি তোমার জন্যে কি করতে পারি।

তারপর প্রথমে কয়েকমাস দিলে দশ টাকা ক'রে, এখন সেই দশ টাকা সাত টাকায় দাঁড়িয়েছে। তাও-বা কোনও মাসে আসে, কোনও মাসে আসে না। গরুর গাড়ী চ'ড়ে কারখানায় গিয়ে উমানাথকে সেই সাতটি টাকা নিজে নিয়ে আসতে হয়।

সাত টাকায় সংসার তার চলে না, দুঃখকষ্টের আর সীমা নাই। বিনয়বাবুও তা মরবার আগে জেনে গেছেন, সরোজও তা জানে।

আজই কস্‌বা থেকে এসে আবার আজই সুশীলা কস্‌বায় ফিরে যাবে শুনে সরোজের মনটা কেমন যেন ক'রে উঠলো। অন্য বোনেরা এলে যদি-বা দু'চার দিন থেকে যায়, এই বোনটির কিন্তু থাকবার উপায় নেই। সরোজের এক-এক সময় মনে হয় সে যদি কোথাও থেকে কিছু টাকা পেতো ত' তার এই মেজদিদির দুঃখ কষ্ট কিছুই থাকতো না। উমানাথকে ভাল ক'রে ডাক্তার দেখানো দরকার, টাকার অভাবে তাও হয় না। দু' বেলা পেট ভরে খেতেই পায় না ত' ডাক্তার দেখাবে কোত্থেকে!

সরোজ জিজ্ঞাসা করলে, আজ তোমাকে যেতেই হবে, না মেজ্‌দি?

সুশীলা বললে, হ্যাঁ ভাই, না গেলে কেউ যে খেতে পাবেনা!

সরোজ তক্ষুনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে একখানা গরুর গাড়ী ডেকে আনলে।

সুশীলা তার ছেলেটিকে কোলে নিয়ে গাড়ীতে চড়তে গিয়ে দেখে, সরোজ কোন্ সময় কাপড়ের একটা পোঁট্‌লায় কতকগুলো চাল, কিছু ডাল আর কিছু তরকারি দিয়েছে বেঁধে।

সুশীলা বললে, তুই আবার কেন এ-সব দিতে গেলি বল্ ত'?

সরোজ এমনি ভাবে চুপ করে রইলো যে তার মুখখানা

দেখলেও কষ্ট হয়। সুশীলা তার এই ভাইটির অবস্থাও জানে। অথচ এগুলি সে না যদি নেয় ত' সরোজের দুঃখের আর সীমা থাকবে না।

সরোজ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অতি কষ্টে তার চোখের জল চেপে বললে, নে মেজ্‌দি, ওঠ্‌।

সুশীলা তার এই ভাইটির মুখের পানে তাকাতে-তাকাতে গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লো। গাড়োয়ান গাড়ী ছেড়ে দিলে।

আব্‌ছা জ্যোৎস্নার আলোয় গাড়ীর ভেতর সুশীলার মুখখানা আর দেখা গেল না। সরোজ কিন্তু সেইদিক পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। যে-কথাটা সে তার মুখের ওপর বলতে পারলে না, এতক্ষণ পরে বোধকরি সেই কথাটাই সে চুপিচুপি আপন মনেই বলে উঠলো—ওই কি আর দেওয়া দিদি? আমারও যে—

চোখ দুটো তার জলে ছল্‌ ছল্‌ ক'রে এলো, কথাটা সে আর শেষ করতে পারলে না।

** ** **

নগেনবাবু বাড়ী তৈরি করবার জন্যে এখানে এসেছিলেন। টাকার জোরে অসম্ভবও যে সম্ভব হতে পারে তা তিনি দেখিয়ে দিলেন। এই দারুণ গ্রীষ্মে বাড়ী থেকে লোকজন এক পা বেরোতে পারে না, আর তিনি কিনা রীতিমত জন-

মজুর খাটিয়ে চমৎকার ঐ দোতলা বাড়ীখানি শেষ ক'রে ফেললেন।

বাড়ী শেষ ক'রেই তিনি কলকাতা গিয়েছিলেন, ফিরে এলেন শ্রাবণ মাসে। চারিদিকে তখন বর্ষা নেমেছে।

এবার কিন্তু তিনি একা এলেন না, এলেন সপরিবারে। এখানকার এই নূতন বাড়ীতে কিছুদিন বাস করবার জন্যে।

খুব ধুমধাম করে গৃহ-প্রবেশের উৎসব সুরু হ'লো। কাঞ্চিপুর শহরের অনেক ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করলেন। সেই সঙ্গে সরোজকেও বাদ দিলেন না।

রুপোলী কাগজের ওপর সোনালী অক্ষরে ছাপা নিমন্ত্রণের পত্রখানির দিকে সরোজ একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছে, অদৃষ্টের এমনি পরিহাস, ঠিক সেই সময় এলো কস্‌বা থেকে একটা লোক—সুশীলার একখানি চিঠি নিয়ে।

সুশীলা লিখেছে—

ভাই সরোজ, তোমাদের জামাইবাবুর অবস্থা খুব খারাপ, পারো ত' একটিবার এসো। আমি একা কি যে করব কিছুই বুঝতে পারছি না।

সরোজ তক্ষুনি ছুটলো তার চাকরির জায়গায়। একটি দিনের ছুটি নিয়ে সে কস্‌বায় গেল।

গিয়ে দেখে, উমানাথ মর-মর। তখনও মরেনি, কিন্তু মরবার দেরিও বিশেষ নেই। সুশীলা গুম্ হ'য়ে তার শিয়রের কাছে বসে আছে, এতটুকু চাঞ্চল্য নেই, চোখে একফোঁটা জল নেই।

সরোজকে দেখে বললে, আয় বোস্, আর দেরি নেই।

দেরি নেই—কথাটা সে এমনভাবে উচ্চারণ করলে যে, শুনে অতি বড় পাষণ্ডেরও চোখে জল আসে।

সরোজ দেখলে, উমানাথ নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে আছে, চোখের কোণে দু' ফোঁটা জল! মুখে কথা নেই, বুকের স্পন্দন ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে।

সরোজ জিজ্ঞাসা করলে, ছেলেরা কোথায়?

সুশীলা মুখ ফিরিয়ে রান্নাঘরটা দেখিয়ে দিলে। দেখা গেল, এক থালা মুড়ি নিয়ে তারা দু' ভাই-এ খেতে বসেছে, আর ছোট ছেলেটি এক-গা ধুলো-মাটি মেখে উঠোনে আপন মনেই খেলা করছে।

সরোজ বললে, কারখানার সাহেবকে একবার খবর দিলিনি কেন মেজ্‌দি? এ-সময় টাকাকড়ি দিয়ে সাহায্য না করুন, হাঁসপাতালের ডাক্তারকেও ত' একবার পাঠিয়ে দিতে পারতেন।

সুশীলা গম্ভীরমুখে ঘাড় নেড়ে বললে, না।

সরোজ চুপ ক'রে কি যেন ভাবতে লাগলো।

সুশীলা আবার বললে, না ভাই, সাহায্য আর কারও কাছে চাইবো না। যা হয় হোক।

মনে হ'লো, সুশীলা সাহসে বুক বেঁধেছে।

তা সে-কথা বোধ হয় সত্যি।

সন্ধ্যার আগেই উমানাথ মরে গেল। সরোজ ভেবেছিল সুশীলাকে এ অবস্থায় সাম্‌লানো হয়ত' দায় হ'য়ে উঠবে। কিন্তু সাম্‌লানো দূরের কথা, চোখ দিয়ে তার এক ফোঁটা জলও পড়লো না। শ্মশানে গিয়ে হাতের শাঁখা নোয়া ফেলে, সিঁথির সিঁদুর মুছে সে বাড়ী ফিরে এলো।

শ্মশানে মড়া পুড়িয়ে শ্মশান-বন্ধুদের বাড়ী ফিরতে হয়। সরোজ তার গায়ের জামাটা খুলে কাচতে গিয়ে পকেট থেকে নগেনবাবুর গৃহ-প্রবেশের সেই রঙিন চিঠিখানি বের ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

সুশীলার ভাঙ্গা-শাঁখা আর নোয়ার কাছে সোনালীরঙের সেই নিমন্ত্রণের চিঠিখানি জ্বল্ জ্বল্ করতে লাগল।

** ** **

এ-অবস্থায় সুশীলা তার ঐ ছোট-ছোট ছেলে তিনটি নিয়ে একা তার এই শ্বশুরবাড়ীতে থাকবে কেমন ক'রে ভেবে সরোজ বললে, চল্ মেজ্‌দি, তুই আমার ওখানেই চল্।

সুশীলার চোখদুটো লাল। লুকিয়ে কেঁদেছে কিনা তাই-বা কে জানে! ঘাড় নেড়ে বললে, না।

সরোজ বল্‌লে, এখানে থাকবি কেমন ক'রে মেজ্‌দি? খাবি কি?

সুশীলা বললে, সে ব্যবস্থা আমার আছে। সরোজ, তুই বাড়ী যা।

সুশীলার এই বিপদে অন্যান্য লোকেরা তাকে সমবেদনা জানালে। বড়বোনের অবস্থা ভাল। সে চিঠি লিখে লোক পাঠালে। লোক এসে বললে, মা আপনাকে যেতে বলেছেন, চলুন আপনি ছেলেদের নিয়ে।

সুশীলা কিছুতেই গেল না। বললে, না বাবা, আমার যাবার উপায় নেই। দিদিকে বোলো আমি বেশ ভালই আছি।

এমনি ক'রে সুশীলা তার স্বামীর ভিটে আঁকড়ে প'ড়ে রইলো।

** ** **

সরোজ তার এই মেজ-দিদিটির খবর মাঝে-মাঝে নিতো। কতবার বলতো, দিদি, এখনও বল্‌ছি তুই চল্‌ আমার কাছে।

সুশীলা বলতো, না রে না, যাবার হ'লে অনেক আগেই যেতাম।

কিন্তু এমন ক'রে তুই যে মরে যাবি দিদি!

সুশীলা তার ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হেসে বলতো, মরে যাব? তা বেশ ত'—সব জ্বালাই জুড়িয়ে যাবে!

সরোজ আর কোনও কথা বলতো না। সুশীলার মুখের হাসি দেখে তার বুকের ভেতরটা কেমন যেন ক'রে উঠতো, চোখদুটো ছল্ ছল্ ক'রে আসতেই সেখান থেকে সে লুকিয়ে পালাতো।

এমনি ক'রে মাস-পাঁচ-ছয় কাট্‌লো কোন রকমে। তার পর হঠাৎ একদিন দুপুরে সরোজ বাড়ী থেকে বেরোতে যাচ্ছে, দরজায় দেখলে সুশীলার তিনটে ছেলে এসে হাজির। ছোট সেই বাচ্চা-ছেলেটাকেও তারা টানতে টানতে হিঁচ্‌ড়ে-হিঁচ্‌ড়ে নিয়ে এসেছে।

সরোজ জিজ্ঞসা করলে, কিরে, তোরা এলি কোত্থেকে? মেজ্‌দি কোথায়?

বড় ছেলেটা বললে, মা মরে গেছে!

মেজ ছেলেটা তার গালে এক চড় মেরে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, বাঃ! বেণী-কাকা যা বলতে বললে তাই বল্‌না!

সরোজের মাথার ভেতরটা কেমন যেন গোলমাল হ'য়ে গেল।

বললে, বেণী-কাকা কে রে? সে-ই তোদের এখানে পাঠালে বুঝি?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, বলছি দাঁড়াও। একে একবার ধরো ত'! ব'লে তার ছোট ভাই-টিকে মামার কোলে তুলে দিয়ে মেজ ছেলেটা বললে, বেণী-কাকাকে চেনো না মামা? সেই যে বুড়ো-মতন, চোখে চশমা—

সরোজ তখন সুশীলার খবর জানবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। বললে, চুলোয় যাক্ তোর বেণী-কাকা! তোর মা কেমন আছে বল্!

ওই যে বললাম গো, মরেনি এখনও, মরছে। বেণী-কাকা বললে, তোর মামাকে নিয়ে আসবি সঙ্গে ক'রে। চল—তোমাকে নিতেই আমরা এসেছি।

ছোট ছেলেটাকে সরোজ তার স্ত্রীর কাছে রেখে এদের দু'জনাকে সঙ্গে নিয়ে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লো। বললে, চল্—দেখি।

গিয়ে দেখে, সত্যিই তাই। ঘরের এক কোণে উমানাথ যেখানে মরেছিল সেইখানে সুশীলা নির্জীবের মত চুপ করে শুয়ে-শুয়ে আপন মনেই বিড় বিড় ক'রে কি-যেন বলছে। মানুষ-অভাবে শুশ্রূষা হয় নি, অর্থের অভাবে ডাক্তার আসে নি, কবে থেকে এ-রকম অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে তাই বা কে জানে। ছেলে দুটো কিছুই ঠিক ক'রে বলতে পারে না। বড়টা বলে, পরশু, ত' মেজটা বলে, না, তারও আগে—তুমি ওর কথা শুনো না মামা।

বড় বলে, ইষ্টুপিট্ আচ্ছা মিথ্যেবাদী ত'? ডাকবো বেণী-কাকাকে?

মেজ বলে, ডাক্ না! বেণী-কাকা ত' এখন ইস্কুলে আছে।

বড় বলে, দেখেছ মামা, ওর বুদ্ধি ছ্যাখো! আজ রবিবার না? ইস্কুলের ছুটি ত'।

সরোজ বললে, কই ডাক্ দেখি—যা দৌড়ে যা!

রেডী! ওয়ান্, টু, থ্রি!—ব'লে দু'জনেই ছুটলো।

সরোজ দেখলে, সুশীলা মাঝে-মাঝে চোখ চেয়ে তাকাচ্ছে বটে, কিন্তু চিনতে কাউকেই পারছে না।

সরোজ ডাকলে, মেজ্‌দি—দিদি !

বলতে গিয়ে ঠোঁট দুটো তার থর্‌-থর্‌ ক'রে কেঁপে উঠলো, চোখ দুটো তার জলে ভরে এলো।

সুশীলা কিন্তু সেদিকে কানও দিলে না, চিনতেও পারলে না। হঠাৎ বোধকরি বিকারের ঘোরেই চীৎকার ক'রে উঠলো, বাবা ! এসো বাবা, এসে বোসো এইখানে। এতদিন পরে আমাকে মনে প'ড়লো বাবা ?

সরোজের চোখ দিয়ে তখন দর-দর করে জল গড়াচ্ছে।— মেজ্‌দি ! ও মেজ্‌দি ! বাবা কোথায় ?

সুশীলা অতি কষ্টে আপন মনেই যেন তার বাবার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো।—জ্যাঠামশাইকে তুমি এত ক'রে বলে গেলে বাবা, কিন্তু জ্যাঠামশাই কিছু দিলে না। কেমন সুন্দর বাড়ী করেছে দেখেছ ?

এমন সময় বেণী-কাকা এসে ঘরে ঢুকলো। মাথার চুলগুলো কতক্‌ কাঁচা, কতক্‌ পাকা, গলায় ধপ্‌-ধপে সাদা পৈতে, পায়ে খড়ম্‌।

এসেই সরোজের দিকে তাকিয়ে বললে, এই যে, তুমি এসেছ বাবা ? ভালই হ'য়েছে। আমি পাশের বাড়ীতেই থাকি।

এমন সময় সুশীলা আবার কি-যেন বলে উঠলো। দু'জনেই সেই দিকে তাকালে। বেণী-কাকা বললে, ওই দ্যাখো বাবা,

ওই এককথা আজ তিন দিন ধ'রে বলছে। জ্যাঠামশাই কেমন সুন্দর বাড়ী তৈরি করেছে, জ্যাঠামশাই কিছু দিলে না বাবা……এই-সব।

কথাবার্ত্তায় জানতে পারা গেল, এই লোকটিই সুশীলার প্রতিবেশী। উমানাথ মরবার পর থেকে ইনিই দেখাশোনা করছেন, কিন্তু এবার আর শুধু দেখাশোনায় চলবে না, ভাল একজন ডাক্তার ডাকতে হবে, অথচ পরের জন্যে খরচ করবার মত পয়সা তাঁর নেই, কাজেই আজ সকালে তিনি ছেলেদের পাঠিয়েছিলেন সরোজের কাছে।

সরোজ ভাল একজন ডাক্তার নিয়ে এলো, কিন্তু কিছুতেই তার জ্ঞান ফিরলো না। সরোজ নিজে অনেক ডাক্‌লে, মেজ্‌দি, মেজ্‌দি। অনেক কাঁদলে। বললে, মেজ্‌দি, তুমি যে আমায় খুব বেশী ভালবাসতে মেজ্‌দি, আমায় শুধু একবার তুমি সাড়া দাও, একটিবার ফিরে তাকাও আমার দিকে!

সরোজ কেঁদে কেঁদে সারা হ'লো, ছেলে দুটো কাঁদতে লাগলো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না। উপবাসে অনাহারে বিনা শুশ্রূষায় বিনা চিকিৎসায় সেই দিনই রাত্রে সে মরে গেল।

ছোট-ছোট ছেলে তিনটিকে একেবারে নিরাশ্রয় ক'রে দিয়ে মরবার ইচ্ছে সুশীলার ছিল না, তবু তাকে মরতে হ'লো।

ছেলে তুটিকে সঙ্গে নিয়ে কস্‌বার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে সরোজ বাড়ী ফিরে এলো।

সুশীলার মৃত্যুর শোক তখনও সে ভোলে নি, এমন দিনে হঠাৎ একটা লোক এসে সরোজকে বললে, বাবু একবার আপনাকে ডাকছেন, আসুন।

সরোজ বললে, বাবু কে?

নগেনবাবু—ওই যে ওখানে ওই নতুন বাড়ী—

থাক্, আর বলতে হবে না। যাব, আজ সন্ধ্যার সময় দেখা ক'রে আসব।

লোকটা বললে, যাবেন কোথায়? বাবু ত' এই রাস্তায় রয়েছেন গাড়ীতে ব'সে।

সরোজ তার পিছু-পিছু রাস্তায় এসে দেখলে, নূতন একখানা ঝক্‌ঝকে মোটরের ওপর নগেনবাবু বসে আছেন। সরোজকে দেখেই বললেন, বলি, কি হে নবাব, নিমন্ত্রণ করলাম, খেতে গেলে না, তারপর শুনছি নাকি হরীতকীর ব্যবসা আরম্ভ করেছ?

সরোজ বললে, নিমন্ত্রণ যেদিন করেছিলেন সেইদিন আমার মেজ ভগ্নীপতি মারা গেলেন, এখানে আমি ছিলাম না। তারপর গেল-রবিবারে মেজ্‌দিও মারা গেল।

নগেনবাবু বললেন, তোমার মেজ্‌দিদি মানে সুশীলা মারা গেছে?

একটা ঢোক্ গিলে সরোজ বললে, হুঁ।

চোখ দিয়ে তার টপ্ টপ্ করে' দু' ফোঁটা জল পড়লো। কিন্তু যাক্, সে-কথা জিজ্ঞাসা করতে নগেনবাবু আসেন নি। তিনি এসেছেন—নূতন মোটর গাড়ীখানা দেখাতে, আর এসেছেন হরীতকীর কারবার সে করছে কি-না তাই জানতে।

বললেন, বাবা কি তোমার খদ্দেরদের একটা লিষ্টি রেখে গিয়েছিল নাকি? চুরি ত' সে অনেকই করেছে, এও করবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি।

সরোজ তখন সুশীলার কথাই ভাবছিল। বললে, কি বলছেন ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ভেংচি কেটে নগেনবাবু বললেন, তা বুঝবে কেন? লিষ্টি তোমার বাবা যদি না রেখে গেছে ত' কারবার তুমি সুরু করলে কেমন ক'রে?

সরোজ বললে, কারবার? কই, কারবার ত' আমি করিনি। আমি ত' সেইখানেই সেই মাড়োয়ারীর গদিতে—

নগেনবাবু কথাটা তাকে শেষ করতে দিলেন না। বললেন, বুঝেছি। টাকা মাড়োয়ারীর, আর তোমার······হুঁ, চালাও। কিন্তু ভাল কাজ ক'রছ না সরোজ, এই আমি বলে গেলাম।

গাড়ী চলে গেল।

সরোজ অবাক্ হ'য়ে হাঁ করে সেই দিকে চেয়ে রইলো।

** ** **

নগেনবাবু কতবার যে এই কাঞ্চিপুরের নূতন বাড়ীতে এলেন আর গেলেন তার ইয়ত্বা নেই। এবার এসেছিলেন নূতন মোটর গাড়ী নিয়ে। এখানকার লোকগুলোকে নিজের ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে তাক্ লাগিয়ে দেবার জন্যেও বটে, আর স্বাস্থ্যকর জায়গায় হাওয়া বদলাবার জন্যেও বটে।

সেদিন হঠাৎ কি-একটা জরুরী কাজে তাঁকে কলকাতা যেতে হচ্ছিল। যাচ্ছিলেন একা। দু'দিন পরেই আবার ফিরে আসবেন।

গাড়ী ধরবার জন্যে ষ্টেশনে এলেন। একটুখানি আগেই এসে পড়েছেন। ট্রেন আসতে তখনও প্রায় আধঘণ্টা দেরি। সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনে তিনি প্লাটফর্ম্মের একপাশে একখানা বেঞ্চের উপর চুপ করে বসে রইলেন। গ্রীষ্মকাল। ঝুর ঝুর ক'রে বাতাস বইছে। বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক্‌সময় তন্দ্রা এলো।

ছোট্ট ষ্টেশন। প্লাটফর্ম্মে আলো একরকম নেই বললেই হয়। আধো-আধো-অন্ধকারে তন্দ্রার ঘোরেই হঠাৎ তিনি চমকে উঠলেন। ঠিক যেন মনে হ'লো, বিনয়বাবুর মেজ মেয়ে সুশীলা তার কাছে এসে হাতযোড় ক'রে বলছে, কিছু দিন না জ্যাঠামশাই, আমার বড় কষ্ট!

চম্‌কে জেগে উঠেই নগেনবাবুর মনে হ'লো তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু এদিক-ওদিক তাকাতেই দেখেন, দূরে এক অন্ধ ভিখারীকে সঙ্গে নিয়ে একটি মেয়ে ভিক্ষে চেয়ে-চেয়ে বেড়াচ্ছে! যাক্, তাহলে স্বপ্ন নয়। সম্ভবতঃ ওদেরই কণ্ঠস্বর তাঁর কানে এসে বেজেছিল, তাই এ-কথা তাঁর মনে হয়েছে। তবু ভালো।

অন্ধকারে প্লাটফর্মে বসে থাকতে তাঁর আর ইচ্ছে হ'লো না। লোকজনের সুমুখে গিয়ে বসা যাক্—ভেবে যেই তিনি চেয়ার থেকে উঠতে গেলেন, অমনি তাঁর বুকের ভেতরটা কেমন যেন ক'রে উঠলো। হাত দিয়ে বুকটাকে চেপে ধরে তিনি আবার বসে পড়লেন। এমন-ধারা যন্ত্রণা ত' তাঁর কোনদিন হয় না!

খানিকক্ষণ তেমনি চুপ করে বসে রইলেন। কিন্তু যন্ত্রণা যেন বেড়েই চলেছে। এ অবস্থায় কলকাতায় যাওয়া তাঁর উচিত হবে না। টিকিট নষ্ট হয় হোক। মোটর নিয়ে শোফার তখনও ষ্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়েছিল। ট্রেন ছেড়ে দিলে তবে সে বাড়ী ফিরে যাবে—এই হুকুম!

নগেনবাবু অতি কষ্টে ষ্টেশনের বাইরে গিয়ে মোটরে চড়ে বসলেন। শোফারকে বললেন, বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে চল। কলকাতায় যাওয়া আজ আর হবে না।

নতুন বাড়ীতে গিয়ে নগেনবাবু শয্যা গ্রহণ করলেন। স্ত্রী-পুত্র তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলো। ভাল ডাক্তার এখানে পাওয়া যায় না। তবু যেমন হোক্ একজন ডাক্তার আনবার জন্যে মোটর নিয়ে তার এক ছেলে গেল শহরে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ডাক্তার এলেন। ডাক্তার যখন সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠছেন, এমন সময় রোগীর ঘর থেকে কান্নার রোল উঠলো।

ডাক্তার দেখলেন, সব শেষ হয়ে গেছে। রোগী হার্ট ফেল্ করেছে।

বাড়ীর কর্ত্তা গেলেন চলে।

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়ে গিন্নি বললেন, চল বাবা, এখানে আর না।

কলকাতায় যাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে। জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। গাড়ী রিজার্ভ করা হয়ে গেছে। নগেনবাবুর বড় ছেলে হঠাৎ ছট্‌ফট্ করতে লাগলো। কলেরা হয়েছে।

ডাক্তার ডাকবার জন্যে লোক ছুটলো মোটর নিয়ে। একজনের জায়গায় চারজন ডাক্তার এলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। রোগী মরে গেল।

নগেনবাবুর বৃহৎ সংসার তার পরের দিনই কাঁদতে কাঁদতে

কলকাতায় চলে গেল। কাঞ্চিপুরের নতুন বাড়ী খাঁ খাঁ করতে লাগলো।

নগেনবাবুর সংসারে কি অভিশাপ যে লাগলো কে জানে। নগেনবাবুর ছুটি মাত্র ছেলে! একজন ত' কাঞ্চিপুরেই মরেছে, বাকি যেটি ছিল, ছ' মাস পেরোতে না পেরোতে সেটিও গেল।

কাঞ্চিপুরের বাড়ীতে তারা জীবনে কেউ আর যাবে না প্রতিজ্ঞা করেছে। লোকজন কেউ যেতে চাইলে তৎক্ষণাৎ তারা অনুমতি দেয়। কিন্তু অবাক কাণ্ড, কেউ সেখানে দশ দিনের বেশি থাকতে পারে না।

সেই থেকে সে অভিশপ্ত বাড়ী তেমনি খাঁ খাঁ করছে। লোকে একে ভূতের বাড়ী বলবে না ত' কি আর বলবে!

মোনা-ডাকাত

মোনা-ডাকাতের নাম শোনেনি এরকম লোক আমাদের ও-অঞ্চলে একরকম নেই বললেই হয়। ইয়া লম্বা-চওড়া জোয়ান, টাঙ্গির মতন গোঁফ, মাথায় একমাথা বাবরি-কাটা কোঁকড়ানো চুল। শোনা যায় নাকি গায়ের জোর তার অসাধারণ।

তার এই গায়ের জোর নিয়ে কত গল্প, কত কাহিনী যে লোকের মুখে শুনতে পাওয়া যায় তার আর অন্ত নেই! মোনা নাকি একবার একটা হাতী মেরেছিল, বন্দুকের গুলি তার কিছুই করতে পারে না, চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়া,

তেতলা চারতলা বাড়ীর ছাদ থেকে লাফানো—এসব ত' তার কাছে ছেলে-খেলা !

থাকবার মধ্যে গ্রামের এক-টেরে মোনার একখানি কুঁড়ে ঘর ছাড়া আর কিছু নেই। মোনা নিজেই কতবার বলেছে, চুরি ডাকাতি-করা টাকা পয়সা থাকে না বাবু! কেমন ক'রে কোনদিক দিয়ে যে উড়ে যায় নিজেই বুঝতে পারি না।

লোকে বলে, বুঝতেই যদি পারিস, চুরি তাহলে করিস কেন ?

মোনা একটুখানি হেসে জবাব দেয়, থাকতে পারি না বাবু। স্বভাব যায় না মলে !

সংসারে তার নিজের বলতে একদিন সবই ছিল। এখন মাত্র পাঁচ ছ' বছরের ফুট্‌ফুটে সুন্দর একটি নাতনী ছাড়া আর কেউ নেই।

স্ত্রী-পুত্র তার কেমন ক'রে গেল তারও একটা গল্প আছে। সত্য মিথ্যা জানি না, লোকে যা বলে তাই বলছি।

আমাদের গ্রামের উত্তর দিকে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড সোজা চলে গেছে। এই গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডই ছিল মোনার শিকারের জায়গা। রাত্রির অন্ধকারে শহর থেকে জিনিষপত্র নিয়ে যারা যাওয়া-আসা করত মোনার হাতে তারা নিস্তার পেতো না। এই রকম কত নিরীহ যাত্রী যে মোনার হাতে প্রাণ দিয়েছে আর

আর ইয়ত্তা নেই। না চাইতেই মোনার হাতে টাকাকড়ি জিনিষপত্র যারা তুলে দিত তাদের সে কিছু বলত না, কিন্তু জোর জবরদস্তি করলেই মুষ্কিল! মাথার ওপর প্রচণ্ড এক লাঠির আঘাতেই তাকে সে শেষ করে দিত। মৃতদেহ কোনোদিন বা রাস্তার ওপরেই পড়ে থাকত, কোনোদিন বা রাণী-সায়রের পাঁকে দিত পুঁতে।

এর জন্যে পুলিশ যে মোনাকে ধরেনি তা নয়। কতবার ধরে নিয়ে গেছে, কতবার সে জেল খেটেছে, কিন্তু জেল থেকে ছাড়া পেয়েই আবার যে-কে সেই!

প্রায় হপ্তা-খানেক ধরে মোনার একবার কোনো শিকারই মেলেনি। মনের অবস্থা ভারি খারাপ। সন্ধ্যায় সেদিন প্রচুর মদ খেয়ে প্রকাণ্ড একটা লাঠি হাতে নিয়ে শিকারের সন্ধানে রাণী-সায়রের একটা গাছের তলায় মোনা দাঁড়িয়েছিল।

অন্ধকারে হন্ হন্ ক'রে একটা লোক এগিয়ে আসছে দেখে মোনা ছুটে গিয়ে মারলে তার মাথায় এক লাঠি!

লাঠি খেয়ে লোকটা ঘুরে পড়ল। বললে, বাবা, আমি।

আমি কেরে ব্যাটা! আমি-টামি শুনছি না বাবা, আজ সাতদিন চুপ করে বসে আছি, দে তোর সঙ্গে কি আছে দে!

বলেই মোনা হাত পাতলে। কিন্তু একি! লোকটা আর

কথাও কয় না, নড়েও না! বোধহয় এক লাঠিতেই শেষ হয়ে গেছে। অন্ধকারে সে তার গায়ে হাত দিয়ে দেখলে, গায়ে জামা নেই, হাতেও কিছু নেই। টাকাকড়ি হয়ত ট্যাঁকে

গোঁজা আছে ভেবে কোমরের কাপড়টা ভালো করে নেড়ে-চেড়ে দেখলে, ছ'টি মাত্র পয়সা। তাই তা-ই! পয়সা ছ'টা নিয়ে

সে উঠে দাঁড়ালো। বললে, এবারে বাঁচতে পারিস ত' বেঁচে ওঠ্ বাবা, আমার কোনো আপত্তি নেই।

শিকারের সন্ধানে সে আরও কিছুক্ষণ রইলো গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সেদিন আর ওই ছ'টা পয়সার বেশি সে পেলে না, মনের দুঃখে বাড়ী ফিরে এলো।

পরের দিন সকালে গ্রামের মধ্যে এক হুলস্থুল কাণ্ড! মোনা-ডাকাতের ছেলে মাধবের মৃতদেহ রাণী-সায়রের পাড়ে পড়ে আছে। গ্রামের ছেলে-বুড়ো সেখানে ভিড় করে গিয়ে দাঁড়ালো, থানা থেকে পুলিশ এলো, কনেষ্টবল এলো, চৌকিদার এলো।

কথাটা মোনার কানে যেতেই সে একবার চম্‌কে উঠলো। তারপর থম্‌কে দাঁড়িয়ে কি-যেন ভেবে সে ছুটল রাণী-সায়রের দিকে। চোখ দিয়ে তখন তার দর্ দর্ করে জল গড়াচ্ছে। গিয়ে দেখলে, মৃতদেহটাকে জড়িয়ে ধরে তার স্ত্রী তখন চীৎকার করে কাঁদছে আর বুক চাপড়াচ্ছে! বৌ কাঁদছে মাটিতে শুয়ে আর তাদের পাশে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মাধবের দশ বছরের মেয়ে রাণী আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে।

সর্ব্বনাশ! সবাই জানে রাস্তার ধারে রাত-বিরেতে ঠেঙ্গিয়ে মানুষ মারে মোনা-ডাকাত। আজ সেই তারই ছেলেকে

কে মারলে কে জানে! মোনাই যে তাকে মেরেছে সে কথা কেউ ভাবতেও পারলে না। হোক্ না ডাকাত, তাই বলে নিজের ছেলেকে কেউ মারতে পারে নাকি?

অনেকে বলতে লাগলো, এম্‌নিই হয়। কত লোকের কত ছেলেকে সে মেরেছে, আজ তার ছেলে মরবে না ত' কে মরবে। ভগবান আছেন ঠিক।

পুলিশে লাশ্ নিয়ে চলে গেল। কে যে তাকে মেরেছে তার আর কোনো কিনারা হলো না।

এই নিয়ে গ্রামের মধ্যে দিন-পনেরো খুব আন্দোলন চললো। যেখানে সেখানে যার তার মুখে শুধু এই কথা ছাড়া যেন আর কথা নেই।

তারপরেই সব চুপ্‌চাপ্।

এমন দিনে মোনার বাড়ীতে আর এক বিপদ!

ছেলেকে নিজের হাতে খুন করে পর্য্যন্ত মোনা যেন কেমন গুম্ হয়ে গিয়েছিল। কারো সঙ্গে ভালো করে কথা বলতো না, কাজকর্ম্ম তার একদম বন্ধ, বাড়ীতে নিত্য অভাব যেন তার লেগেই রইলো।

স্ত্রী তার ঝগড়া করতে লাগলো, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। এত অধর্ম্ম সইবে কেন?

মোনা চুপ করে রইলো, একটি কথারও জবাব দিলে না।

তারপর মোনা একদিন কিছুতেই আর থাকতে পারলে না। সত্যি কথাটা এখনও সে কাউকে বলেনি। হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যায় তার মনে হলো, কথাটা না বললে এবার সে হয়ত ভেতরে ভেতরে গুম্‌রে গুম্‌রে মরেই যাবে। তাই সে তার স্ত্রীকে বলে ফেললে, দ্যাখো, মাধবকে সেদিন আমিই মেরে ফেলেছি।

স্ত্রী তার মুখের পানে হাঁ করে চেয়ে রইলো—তুমি? কেন?

অন্ধকারে চিনতে পারিনি। নেশার ঝোঁকে—

কথাটা সে আর শেষ করতে পারলে না। শুয়ে শুয়ে ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদতে লাগলো।

মোনা-ডাকাতকে এমন ক'রে কাঁদতে তার স্ত্রী কোনোদিন দেখেনি।

পরের দিন সকালে দেখা গেল, রান্নাঘরে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে মোনার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে।

স্ত্রী গেল, পুত্র গেল, রইলো শুধু বিধবা বৌ আর নাতনী!

বিধবা বৌ তার অনেকদিন থেকেই জ্বরে ভুগছিল। এম্‌নি মজা, শাশুড়ী মরার মাস-খানেক পেরোতে না পেরোতেই বিধবা বৌটাও তার মরে গেল।

বাকী রইলো শুধু তার নাতনী রাণী !

লুকিয়ে লুকিয়ে লোকে বলতে লাগলো, এবার ওটাও যাবে।

মোনারও কেমন যেন মনে হলো—বিধাতার অভিশাপ ! পাপীকে ভগবান বুঝি এমনি করেই শাস্তি দেন।

রাণী বড় সুন্দরী মেয়ে। মোনার বাড়ীতে মেয়েটাকে মোটেই মানায় না—এত সুন্দরী !

সারা গ্রামের মধ্যে তার মত রূপসী আর আছে কিনা সন্দেহ। সাদা ধপ্ ধপ্ করছে তার গায়ের রং, যেন দুধে-আলতায় গোলা। কালো কালো চুলের গোছা তার সারা পিঠটাকে ঢেকে দেয়। মুখের পানে তাকালে আর সহজে চোখ ফেরানো যায় না। দশ বছরের মেয়ে, এম্নি বাড়ন্ত গড়ন, মনে হয় যেন এরই মধ্যে সে কৈশোর অতিক্রম করেছে।

এখন এই মেয়েটাই হলো মোনার একমাত্র অবলম্বন। চব্বিশ ঘণ্টা ডাকে, দিদি !

রাণী কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে, কি বলছো দাদু ?

মোনা বলে, কিছু বলিনি দিদি। কি করছো তাই জিগেস করছি।

রান্না করছি দাদু। অম্বলটা হয়ে গেলেই তোমাকে খেতে দেবো।

মানুষ-মারার ব্যবসা মোনা এখন একদম্ ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়ে দিয়েছে শুধু এই মেয়েটার জন্যে।

নিতান্ত যখন অভাব পড়ে, এতদিনের অভ্যেস, এক একবার তার মনে হয়—যাই, মা কালী বলে কিছু রোজগার করে আনি! কিন্তু লাঠিটা হাতে নিয়েই আবার নামিয়ে রাখে। মনে হয় ভগবান যদি তাকে আবার শাস্তি দেন! যদি এই মেয়েটাও মরে যায়!

আগে সে জেল-কয়েদকে মোটেই ভয় কোরতো না। কত-দিন কত ব্যাপারে তার জেল হয়ে গেছে। হাসতে হাসতে জেলে গিয়ে ঢুকেছে আবার মেয়াদ ফুরোতেই বুকের ছাতি ফুলিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসেছে।

এখন মনে হয়, জেলে যাওয়া তার কোনো মতেই চলতে পারে না। সে যদি জেলে যায়, এই মেয়েটা পথে দাঁড়াবে। একে দেখবার আর কেউ নেই। দু'বেলা দু'মুঠো খাবার অভাবে হয়ত মরেই যাবে।

রাণীকে মোনা সুখে রাখতে চায়। সংসারের কাউকেই ত' সে সুখে রাখতে পারেনি, একরত্তি এই মেয়েটিকেও যদি সে সুখে রাখতে না পারে ত' বৃথাই তার জীবন! বৃথাই সে পুরুষ হয়ে জন্মেছে।

মোনা দিনকতক দূরের একটা শহরে গিয়ে ভিক্ষে করতে আরম্ভ করলে, কিন্তু দিনকয়েক পরে দেখলে, ভিক্ষে তাকে আর কেউ দিতে চায় না। কেউবা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, কেউবা বলে, দিব্যি শরীর রয়েছে, খেটে খাওগে বাবা।

মোনা কি যে করবে বুঝতে পারে না। কায়স্থের ছেলে, লেখা-পড়াও শেখেনি যে কাজকর্ম্ম করবে।

গ্রামের জমিদার বৃদ্ধ অজয় চৌধুরী মস্ত বড়লোক। এক একবার ভাবে, জমিদারকে গিয়ে ধরিগে! আবার ভাবে, এককালে এই জমিদারকে সে গ্রাহ্যও করেনি। কতবার তাঁর আদেশ অমান্য করেছে, এমন কি যখন সে জোয়ান ছিল, এই পৃথিবীটাকে সে অন্য-চোখে দেখতো, তখন সে তাঁকে একটু-আধটু অপমানও করেছে। সেই লজ্জায় এখন সে তাঁর কাছে যেতেও পারে না।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যেতে তাকে একদিন হলোই। জমিদারবাবু বাইরের ঘরে বসে ছিলেন, মোনা তার হাতের লাঠিটি মাটিতে নামিয়ে তাঁর পায়ের কাছে ঢিপ্ কোরে একটি প্রণাম করলে।

অজয় চৌধুরী মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, কি রে? মোনা কি মনে কোরে?

মোনা বললে, বাবু একটা চাক্‌রি-বাক্‌রি দিন।

কেন? ডাকাতি করগে যা না!

মোনার চোখ দু'টো ছল্‌ছল্‌ করে এলো। বললে, আর লজ্জা কেন দিচ্ছেন কর্ত্তা!

খানিক চুপ করে থেকে জমিদারবাবু বললেন, চাকরি করবি? বেশ, তবে কাল থেকে আমার চাপরাশীর কাজ কর্‌।

মোনা হাসতে হাসতে বাড়ী ফিরে এলো। বাড়ীতে ঢুকেই ডাকলে, দিদি!

রাণী ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়ালো।

মোনা বললে, কাল থেকে জমিদার-বাড়ীতে চাক্‌রি করবো দিদি! এবার আর তোর ভাবনা নেই। ভালো ভালো শাড়ী এনে দেবো,...তুই যা চাইবি দিদি, তাই এনে দেবো।

আমার কিছুই চাই না দাদু, বলে রাণী চলে যাচ্ছিলো, মোনা বললে, চলে যাচ্ছিস কেন ভাই, শোন্! কিচ্ছু চাইনে? ভালো একটি বর যদি এনে দিই........

যাঃ-ও!

লজ্জায় এবার সে সত্যিই চলে গেল।

আনন্দে মোনার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এলো।

দুই নাতনী-ঠাকুর্দ্দায় পরমানন্দে দিন কাটছিল। মোনার

সংসারে আর তেমন অভাব নেই। মাইনে যা পায় তাই দিয়ে ছু'জনের বেশ চলে যায়।

জয়নগরের একটা বাঁধের দখল নিয়ে ছুই জমিদারে বাধল একটা মামলা। এক তরফে আমাদের এই অজয় চৌধুরী, আর এক তরফে জয়নগরের জমিদার। বাঁধে জোর করে মাছ ধরিয়ে দখল নিতে হবে।

অজয় চৌধুরী মোনাকে ডেকে বললেন, মোনা পারবি ?

জমিদারবাবুকে একটি প্রণাম করে লাঠিগাছটা তুলে নিয়ে মোনা উঠে দাঁড়ালো।

তারপর জনকতক জেলে সঙ্গে নিয়ে মোনা একাই গেল পুকুরের দখল নিতে।

প্রকাণ্ড বড় বড় পাঁচটা মাছ নিয়ে মোনা ফিরে এলো। জমিদার খুশী হয়ে তার দিকে তাকাতেই দেখলেন, তার কাপড়ে কাঁচা রক্তের দাগ, লাঠিটা রক্তে রাঙা হয়ে গেছে। একি! খুন-খারাপি হয়ে গেছে নাকি ?

হাসতে হাসতে মোনা বললে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা এমন ত' হয়েই থাকে বাবু। বেশি কিছু হয়নি, একটা ছোঁড়া মনে হলো যেন পড়ে গেছে।

পড়ে গেছে কি'রে ?

একটা ছোঁড়া এসেছিল আমার মাথায় লাঠি চালাতে। জন-

পঞ্চাশেক এসেছিল বাবু, তা কেউ এগোলো না, শুধু ওই একটা ফাজিল ছোঁড়া বলে কিনা—রেখে দে তোর মোনা-ডাকাত, বুড়ো হয়েছিস এখন আর তোর—আর বেশি কিছু বলতে দিইনি বাবু।

অজয় চৌধুরী জিগেস করলেন, খুন করে ফেললি ?

মোনা বললে, আজ্ঞে না, খুন আমি আর করব না পিত্তিজ্জে করেছি। মাথায় মারিনি, খুন ঠিক হবে না, তবে হাত দু'টো হয়ত গেছে।

চৌধুরী বললেন, তা বেশ করেছিস। যা, কাপড়টা বদলে হাত পা ধুয়ে ফ্যাল।

কিন্তু তার পরের দিন বাধল এক মহা গণ্ডগোল! পুলিশ এলো মোনাকে ধরে নিয়ে যেতে।

চৌধুরীমশাই অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু মোনা-ডাকাত এ-অঞ্চলে বিখ্যাত লোক। গ্রামের অধিকাংশ লোকই তাকে চিনে ফেলেছে। পুলিশ শেষ পর্য্যন্ত তাকে ধরে নিয়ে গেল বটে, কিন্তু অজয় চৌধুরী জামিন দিয়ে সেইদিনই তাকে ছাড়িয়ে আন্‌লেন।

মামলা চলতে লাগলো। অজয় চৌধুরী চেষ্টার ক্রটি করলেন না, টাকাও বিস্তর খরচ করলেন। কিন্তু মোনাকে তিনি খালাস

কিছুতেই করে আনতে পারলেন না। মোনার একমাস জেল হয়ে গেল।

মোনা ডুক্‌রে ডুক্‌রে কেঁদে উঠল। একমাস মাত্র জেল, তারই জন্যে মোনা আজ কিনা ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদছে। অবাক কাণ্ড! এ রকম জেল তার কত হয়েছে, কোনোদিন কেউ তাকে কাঁদতে দেখেনি।

সবাই বলতে লাগল, চিরদিন কি আর কারো সমান যায় রে বাবা! বুড়ো হয়েছে, আর কি সে জেলের কষ্ট সইতে পারে!

কিন্তু হায়, কেউ তার মনের কথা বুঝলে না! জেলের জন্যে সে কাঁদেনি, কাঁদছে সে রাণীর জন্যে। কাঁদতে কাঁদতে সে জেলে গিয়ে ঢুকল।

একমাস—মাত্র তিরিশটি দিন। দেখতে দেখতে কেটে গেল। মোনা গ্রামে ফিরে এলো। পাগলের মত ছুটতে ছুটতে সে তার বাড়ীর দরজায় এসে ডাকলে, দিদি! দিদিমণি! আমি এসেছি।

কিন্তু একি! কারও সাড়া না পেয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখে, দরজায় তালা বন্ধ। বাড়ীতে কেউ নেই। রাণী গেল কোথায়?

মোনা তখনি জমিদারের বাড়ীর দিকে ছুটল। অজয়

চৌধুরী বাইরের ঘরে একলা বসে ছিলেন, উন্মাদের মত মোনা তার পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে পড়ল—আমার দিদিমণি কোথায় গেল বাবু ?

দিদিমণি ? চৌধুরীমশাই হাসতে লাগলেন, বললেন, সে পালিয়েছে।

পালিয়েছে কি ? মোনা তাঁর মুখের পানে হাঁ করে তাকিয়ে বললে, হাসছেন যে ?

দাঁড়া, আসছি। বোস্, একটু ঠাণ্ডা হ'। বলে চৌধুরীমশাই বাড়ীর ভেতর উঠে গেলেন।

মোনা হতভম্বের মত বসে রইলো, ভালো করে কিছুই বুঝতে পারলে না।

খানিক পরেই জমিদারমশাই-এর বদলে সেখানে এসে দাঁড়ালো রাণী।

রাণীকে দেখে মোনা চীৎকার করে উঠল, দিদি !

রাণীও তার কাছে ছুটে এলো, বললে, দাদু তুমি এসেছো ? আমার জন্যে সেখানে খুব ভাবছিলে বুঝি ?

পরস্পর মুখের পানে তাকিয়ে কেঁদে ভাসালে। তারপর কান্না থামলে, তাদের সে কত কথা !

মোনা দেখলে রাণী এখানে বেশ সুখেই আছে। কেনই বা থাকবে না ! একে জমিদারের বাড়ী, তার ওপর ভালো

করে তুবেলা খেতে পায়, ভালো ভালো শাড়ী পরে, গয়না পরে—রাণী সেজেছে ঠিক রাজার রাণীর মত !

মোনা তার দিকে তাকিয়ে আর যেন চোখ ফেরাতে পারে না।

রাণী বললে, চল দাতু, এবার আমরা যাই।

মোনার যেন ধ্যান ভাঙ্‌ল। বললে, কোথায় যাবি ভাই?

রাণী বললে, আমাদের বাড়ীতে।

আমাদের বাড়ীতে? কেন দিদি, এখানে ত' বেশ সুখে আছিস্।

রাণী কিন্তু জিদ্ ধরে বসলো, তা হোক দাদু, আমি তোমার কাছে থাকবো।

আমার কাছে? মোনা একটু হেসে বললে, আমার কাছে দু'বেলা পেটভরে যে খেতেও পাস্ না দিদি?

রাণী বললে, না দাদু, তা হোক, তুমি চল।

মোনা কি যে করবে কিছু বুঝতে পারলে না। খানিক চুপ করে কি যেন ভেবে বললে, এক গ্লাস জল আনত' ভাই। ভারি পিপাসা পেয়েছে।

রাণী ছুটল বাড়ীর ভেতর থেকে জল আনবার জন্যে।

বেশিক্ষণ যায়নি। জলের গ্লাস হাতে নিয়ে রাণী ফিরে এলো। এসে দেখে, দাদু নেই।

দাদু! দাদু! কিন্তু কোথায় দাদু?

বর্ষাকাল। চারিদিক অন্ধকার, বাইরে তখন ঝম্ ঝম্ করে বাদল নেমেছে।

এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় সে গেল?

গ্লাস হাতে নিয়ে দরজার কাছে অনেকক্ষণ রাণী দাঁড়িয়ে

রইলো। মোনা তবু ফিরল না। গ্লাসটা নামিয়ে রাণী একলা সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল।

ছোট্ট মেয়ে, কেন যে দাদু তার চলে গেল কিছু বুঝতে পারলে না।

কেন যে গেল, কি কষ্টে যে গেল, তা একমাত্র তার দাদুই জানলে আর জানলেন অন্তর্য্যামী।

রাণীর কাছে ফিরে যাবার জন্যে, আর-একটিবার তাকে দেখবার জন্যে বুকের ভেতরটা মোনার কেমন যেন করতে লাগল, কিন্তু তবু কিছুতেই সে ফিরতে পারলে না। ফিরতে পারলে না এই ভেবে, সে সাক্ষাৎ অমঙ্গল, সংসারের কোন মানুষই শুধু তার জন্যে সুখী হয়নি। তার কাছে থাকলে হয়ত' তার রাণীরও কষ্টের আর অবধি থাকবে না। তার চেয়ে, মূর্ত্তিমান অভিশাপ সে, তার দূরে সরে যাওয়াই ভালো।

রাণীর স্থান রাজার বাড়ীতে—ডাকাতের বাড়ীতে নয়।

মরণ-ফাঁদ

বাড়ীতে ভারি ইঁদুরের উপদ্রব স্থুরু হয়েছিল। বড় ইঁদুর, মাঝারি ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর—কতরকমের কত যে ইঁদুর তার আর ইয়ত্তা নেই।

রাত্রে সবাই রুটি খাবে, রুটি তৈরি হ'য়েছে, ঠাকুর ঢাকা দিতে ভুলে গিয়েছিল, বাস্, খেতে বসে দেখা গেল দেড়খানি মাত্র রুটি পড়ে রয়েছে, বাকি সব নিয়ে গেছে ইঁদুরে।

কাঠের একটা পুরনো আলমারিতে ঠাসা এক-আলমারি বই ছিল। বড়বাবুর আমলের কত রকমের কত ভালো ভালো বই। সেবার বড়দিনের ছুটির সময় গিন্নি-মা বললেন, বইগুলো একবার ঝেড়ে-ঝুড়ে ভালো করে সাজিয়ে রাখ্ বাবা, নইলে কাগজপত্র পোকায় কোন্‌দিন দেবে কেটে। বাস্, বই ঝাড়তে গিয়ে দেখি, প্রায় অর্দ্ধেকের ওপর বই নেংটি-ইঁদুরে একেবারে

দিয়েছে নষ্ট ক'রে! এমন ভাবে বইগুলোকে কেটেছে যে সেগুলো আর পড়া চলে না। বইগুলো ফেলে দিতে হ'লো।

ঘরের এককোণে কড়িকাঠ থেকে দড়ি ঝুলিয়ে কাঠের একটা মাচা তৈরি করা হয়েছিল। সেই মাচার ওপর থাকতো যত-রাজ্যের বিছানা। বিছানা মানে প্রত্যহ যেগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো নয়, কর্ত্তাবাবুর আমল থেকে ভালো ভালো লেপ, ভালো ভালো তোষক, বড় বড় তাকিয়া কার্পেট গালিচা— এই রকম সব ভালো ভালো অনেক রকমের অনেক জিনিষ কাঠের সেই মাচার ওপর টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছিল, বাড়ীতে অতিথি এলে সেইখান থেকে বিছানা বালিস পেড়ে দেওয়া হ'তো। সেবার ভাদ্রমাসে বর্ষার মেঘ তখন কেটে গেছে, আকাশ একেবারে পরিষ্কার নীল, রৌদ্রের তেজ হয়েছে ভয়ানক তীব্র, বাড়ীর গিন্নি ঠিক করলেন, বিছানাগুলো ছাদের রোদ্দুরে একবার ফেলে দিয়ে আসা যাক্। মাচা থেকে বিছানাগুলো নীচে নামানো হ'লো। কিন্তু বিছানা নামিয়েই তিনি মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে বসলেন। ইঁদুরে ভালো ভালো বালিসগুলো ফুটো করে তুলো বের করে দিয়েছে, অমন সুন্দর গালিচা দিয়েছে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে। মোটকথা কোনোটাই আর আস্ত রাখেনি। অথচ ইঁদুরের তুলো কিছু খাবার জিনিষ

নয় যে, মাচার ওপর দিব্যি নিরিবিলি পেয়ে মনের সুখে পেট ভরে সব খেয়েছে! শুধু নষ্ট করবার মতলব। গিন্নি বসে বসে ইঁদুরের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে লাগলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, যেমন করে হোক ইঁদুরগুলোকে বাড়ী থেকে তাড়াতেই হবে।

আমাকে ডেকে বললেন, দে বাবা এর একটা কিছু ব্যবস্থা করে।

ইঁদুর তাড়াবার কি ব্যবস্থা করি তাই ভাবছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যবস্থা করি বলুন ত?

গিন্নিও বোধকরি সেই কথাই ভাবছিলেন। বললেন, ইঁদুর-মারা একটা কল কিনে আন্ বাজার থেকে। না না একটা নয়, একটা কলে চলবে না, বাড়ীতে বোধ হয় দু'হাজার চার হাজার ইঁদুর আছে, গোটা-দুই-তিন কল একসঙ্গে পেতে

রাখবো, তারপর বাস্, দেখি কেমন করে ওরা বিছানা কাটে! আহা, আমার এমন সুন্দর গালিচা······কি আর বলবো মুখপোড়া ইঁদুরকে! মর্ মর্, মরে' যা!

সেইদিনই বিকেলে ইঁদুর-মারা কল কেনবার জন্যে বাজারে গেলাম। দু'রকমের কল পাওয়া গেল। এক—খাঁচা-কল আর এক জাঁতি-কল। খাঁচা-কলটা দেখতে ঠিক খাঁচার মত। ইঁদুরগুলো খাবার লোভে ভেতরে ঢুকলে খাঁচা-কলের দরজাটা আপনা থেকেই বন্ধ হ'য়ে যায়। বাস, তখন আর তারা বেরোবার পথ পায় না। জাঁতি-কলটা লোহার তৈরি। সে বড় সাংঘাতিক কল। দোকানদার কলটা ঠিক ক'রে তার হাতের পেন্সিলটা আমায় দেখিয়ে বললে, এইটে ধরুন ইঁদুর, আর কলের এইখানে দেওয়া হয়েছে খাবার। এইবার ইঁদুরটা গেল খেতে। বাস্, যেই খাবারে মুখ দেওয়া, আর বাছাধন তৎক্ষণাৎ একেবারে চেড়েক্-ডেডেং!

দেখলাম তার হাতের পেন্সিলটা কেটে দু'খণ্ড হ'য়ে গেল।

দোকানদার বললে, ইঁদুর যদি বেরালের মত বড় হয় তাতেও ক্ষেতি নেই। যত বড়ই হোক, বাছাধন একেবারে মুসুরি-চ্যাপ্টা হ'য়ে যাবে।

দু'হাতে দু'টো কল হাতে নিয়ে বাড়ী ফিরলাম।

গিন্নি বললেন, হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে। দে বাবা কল

দু'টো ভালো ক'রে পেতে। একটা ভাঁড়ার-ঘরে, আর একটা আমার ওই বিছানার মাচানের ওপর।

রাত্রে কল দু'টো ঠিক ক'রে পেতে দিলাম।

গিন্নি সেদিন পেস্তার অনেকগুলো বরফি তৈরি করেছিলেন। রাত্রে বড় বৌমা জিজ্ঞাসা করলেন, বরফিগুলো ত' ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে মা?

গিন্নি বললেন, না। আজ আর ঢাকা দিয়ে কাজ নেই। ওই বরফির লোভে ইঁদুরগুলো ভাঁড়ারে আসবে, আর ঝপ্ করে কলে পড়ে যাবে।

রাত্রে গিন্নি সেদিন নিজেও ঘুমুলেন না, আর-কাউকে ঘুমোতেও দিলেন না।

ঘনঘন ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন আর বলেন, দ্যাখ্ দেখি বাবা শঙ্কর, মনে হ'লো যেন ঝপাং করে কলে ইঁদুর পড়ার শব্দ হ'লো।

আলো হাতে নিয়ে ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকে দেখি—কলটা যেমন ভাবে পেতে রাখা হয়েছিল তখনও-ঠিক তেম্‌নিই পাতা র'য়েছে।

ফিরে এসে বললাম, কই না, ইঁদুর ত' পড়েনি!

গিন্নির মুখখানি যেন শুকিয়ে গেল। শত্রুর দ্বারা পরাজিত হ'লে বিপক্ষ পক্ষের মুখ যেমন শুকিয়ে যায়—তেম্‌নি। ইঁদুর-

গুলো এখন তাঁর পরম শত্রু। যে-ক্ষতি তারা করেছে, এখন তিনি তাদের নির্ব্বংশ করতে পারলেই যেন বাঁচেন।

বললাম, আপনি জেগে রয়েছেন কেন? জাঁতি-কলে পড়লে তারা আর পালাতে পারবে না। কাল সকালে দেখলেই চলবে।

গিন্নি কি যে বুঝলেন কে জানে। বললেন, তুমি আচ্ছা ঘুম-কাতুরে বাবা! আচ্ছা বেশ, তোমাকে আর জাগাব না, তুমি ঘুমোওগে যাও।

বুঝলাম তিনি আমার ওপর রাগ করলেন। কিন্তু কি করি, উপায় নেই। রাত্রি জাগলেই আমার শরীর অসুস্থ হ'য়ে পড়ে। বড়লোকের বাড়ী বাজার-সরকারী করতে এসেছি বলেই যে সামান্য ইঁদুর মারবার জন্যে সারারাত জেগে বসে থাকতে হবে তার কোনও মানে হয় না। গিন্নির এত সাধের গালিচা

কেটে দিয়েছে, গিন্নি প্রতিজ্ঞা করেছেন, যেমন ক'রেই হোক ইঁদুর-বংশ নির্ব্বংশ তাঁকে করতেই হবে, সুতরাং রাত জেগে বসে থাকতে হয় তিনিই থাকুন।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই-সব কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, রাত জেগে গিন্নির শত্রুনিপাত করতে পারলাম না বলে কাল হয়ত' আমার চাকরিও যেতে পারে। কি আর করি, না ঘুমোলেও কষ্ট হবে।

ভাবতে ভাবতে কখন্ যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বুঝতে পারিনি। বাড়ীর ভেতর হঠাৎ একটা গোলমাল শুনে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসলাম। তারপর ধীরে ধীরে বাড়ীর ভেতর গিয়ে যা স্বচক্ষে দেখলাম, তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি অদ্ভুত। দেখলাম, গিন্নি-মা তাঁর মোটা শরীর নিয়ে ঘরের মেঝের ওপর চিৎ হ'য়ে পড়ে আছেন, মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে, চোখ দু'টো বড় বড় হ'য়ে গেছে। মেজ-বৌ লণ্ঠন নিয়ে তাঁর শিয়রের কাছে বসে বসে ডাকছে, মা! মা!

মা'র কোনও সাড়াশব্দ নেই।

জিজ্ঞাসা করলাম, দাদাবাবু কোথায় গেলেন বৌমা?

মেজ-বৌ বললেন, ডাক্তার ডাকতে।

ভাবলাম, কেন এমন হ'লো।

মেজ-বৌ বললেন, কিছু বুঝতে পারছিনি। ঘর থেকে

বেরিয়ে যখন এলাম, দেখলাম, উনি ছটফট্ করছেন আর বলছেন সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল।

বাস্, তারপর থেকেই কথা বন্ধ।

হঠাৎ আমার কি যেন মনে হ'লো। বললাম, আমায় একটা লণ্ঠন দিতে পারেন ?

মেজ-বৌ বললেন, আমার ওই ঘরের ভেতরে যেটা জ্বলছে ওইটে নিয়ে যাও।

লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে ভাঁড়ার-ঘরে যেখানে ইঁদুর-মারা জাঁতি-কলটা পেতেছিলাম সেইখানে এগিয়ে গেলাম।

সর্ব্বনাশ !

দেখলাম, গিন্নি-মার এত সাধের পেস্তার বরফির টুক্‌রোগুলো ঘরময় ছড়ানো। ইঁদুরে সব খেয়ে ফেলেছে।

আর সেই ইঁদুর খাবার জন্যে বোধকরি ঘরে ঢুকেছিল প্রকাণ্ড একটা গোখ্‌রো সাপ। সেই সাপটা হঠাৎ কেমন ক'রে না জানি জাঁতি-কলে চাপা পড়েছে।

জাঁতি-কলটার খোঁজ করতে গিয়ে দেখি, সাপটা কোমরভাঙ্গা হ'য়ে লেজ দিয়ে কলটাকে দু' তিন পাক জড়িয়ে টানতে টানতে সেটাকে দেওয়ালের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে ক্রমাগত ফোঁস্ ফোঁস্ করে গর্জ্জাচ্ছে আর ঠক্ ঠক্ ক'রে মেঝেতে ফণা ঠুক্‌ছে।

ব্যাপারটা মেজ-বৌমাকে দেখাবার জন্যে তাঁকে ডাকতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় মেজ-বৌমা চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন।

তাড়াতাড়ি ছুটে তাঁর কাছে গিয়ে দেখলাম, গিন্নি-মা মারা গেছেন।

মেজদাদাবাবু এলেন, ডাক্তার এলেন। কিন্তু তখন আর ডাক্তারের কোনও প্রয়োজন নেই।

মেজদাদাবাবু 'মা' 'মা' বলে চীৎকার করে কাঁদতে লাগলেন।

ডাক্তারবাবু তাঁর বন্ধু। তিনিই তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন, কেঁদো না ভাই, মা কারও চিরকাল থাকে না। কি আর করবে বল।

মেজদাদাবাবু কাঁদতে কাঁদতে বললেন, তার জন্যে দুঃখু নেই ভাই, কিন্তু হঠাৎ—সন্ধ্যেবেলায় দিব্যি কথা বললেন আমার সঙ্গে, জ্বর-জ্বালা হ'লো না কিছু না, কি ক'রে মারা গেলেন কিছুই আমি বুঝতে পারছিনি।

ডাক্তারবাবু বললেন, হার্টফেল্ করেছেন হয়ত'। মানুষের মৃত্যুর কি আর কিছু ঠিক-ঠিকানা আছে ভাই! কেঁদো না, চুপ কর।

আমি কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। বললাম, কেন মরেছেন আমি জানি।

তুমি জানো ?—দু'জনেই আমার মুখের পানে তাকালেন।

বললাম, আসুন আমার সঙ্গে, দেখবেন আসুন।

সকলকে সঙ্গে নিয়ে ভাঁড়ার-ঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম। কল্‌টাকে আরও খানিক্‌টা টেনে নিয়ে গিয়ে সাপটা তখনও গর্জ্জাচ্ছে। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে, অনেকটা যেন সে নিস্তেজ হ'য়ে এসেছে।

বললাম, ইঁদুর মনে ক'রে এইটেকে নিশ্চয়ই তিনি চেপে ধরেছিলেন।

কথাটা শোন্‌বামাত্র ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে গেলেন। মৃতদেহ পরীক্ষা ক'রে বললেন, হ্যাঁ ঠিক্‌। পায়ের একটা আঙ্গুলের ফাঁকে কাম্‌ড়েছে।

মেজদাদাবাবুর রাগ গিয়ে পড়লো সাপটার ওপর। লোহার একটা প্রকাণ্ড ডাণ্ডা নিয়ে এসে সাপটার গায়ের ওপর তিনি দুমাদুম্‌ পিট্‌তে লাগলেন। দেখতে দেখতে সাপটা একেবারে চ্যাপ্‌টা হ'য়ে গেল।

গিন্নিমার মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনী রেখে মরেছেন, সুতরাং সুখের মরণ। বিস্তর ফুল আনা হয়েছে। ফুল দিয়ে খাট সাজানো হ'লো।

আমি তাড়াতাড়ি সেই গালিচাটা এনে তাঁর খাটের ওপর পেতে দিলাম।

মেজদাদাবাবু বললেন, দূর! দূর! এটা কি হবে? এটা ইঁদুরে কেটে একেবারে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলেছে যে!

বললাম, তা হোক্। এর জন্যেই উনি মরেছেন। এটা শ্মশান পর্য্যন্ত যাওয়া দরকার।

অনেকদিন পরে বন্ধু সুকুমারের সঙ্গে দেখা।

'কি রে, কেমন আছিস ?'

'ভাল।'

একথা-সেকথার পর বললাম, 'চল্ এই পার্কের বেঞ্চে একটুখানি বসা যাক্। গল্প করিগে চল্।'

দু'জনে একটা বেঞ্চির ওপর গিয়ে বসলাম।

কথা কইতে কইতে হঠাৎ আমার নজর পড়লো—সুকুমার তার হাতের একটি আঙুলের দিকে ঘন-ঘন তাকাচ্ছে।

'ওখানে আবার কি হ'লো তোর ?'

'হয়নি কিছুই।' ব'লে সে তার আঙুলটি আমায় দেখালে।

দেখলাম, একটি আঙুলে আংটি পরার দাগ। আংটিটা বোধ হয় খুলে রাখা হয়েছে, কিন্তু তার দাগ এখনও মিলোয়নি। বললাম, 'আংটির দাগ, না ?'

সুকুমার বললে, 'হ্যাঁ। সে আংটিটা তুই আমার দেখেছিলি ?'

হয়ত' দেখেছিলাম, কিন্তু আংটির কথা কে আর মনে করে' রাখে!

সুকুমার বললে, 'সোনার একটি আংটি। খুব যে দামী জিনিষ, তা নয়। তবে কেমন করে' সেটা আমি পেয়েছিলাম শোন্।···

···বছর-পাঁচেক্ আগে, অভাব কাকে বলে তখন আমি জানতাম না। সন্ধ্যেবেলা একদিন বাড়ী ফিরছি, পথের ওপর একটা মণিব্যাগ্ কুড়িয়ে পেলাম। কার মণিব্যাগ্, কে ফেলে গেছে কে জানে। বাড়ী ফিরে মণিব্যাগটা খুলে দেখি, খুচ্‌রো গোটা পাঁচ-ছয় টাকা, একটি সোনার আংটি আর প্রকাণ্ড একতাড়া নোট। নোটের তাড়াটা গুনে দেখলাম— পাঁচশ' টাকা। আহা বেচারা! যার গেছে এতক্ষণ হয়ত' সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। সারারাত আমার আর ঘুম হ'লো না। দাদাকে বললাম। আনন্দে মুখখানি তার শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। আনন্দে মানুষের মুখ উজ্জ্বল হবারই কথা, কিন্তু দাদার মুখখানি শুকিয়ে গেল এই ভেবে যে, একটা পয়সা সে নিজে কোনোদিন কুড়িয়ে পায়নি, আর এই সুকুমার-ছোঁড়াটা—রোজগার করতে হ'লো না,

পরিশ্রম করতে হ'লো না—এত টাকা একেবারে মুফৎ পেয়ে গেল!

দাদার মনের কথাটা বুঝলাম। বললাম, 'ভেবো না দাদা, যার টাকা তাকে আমি ফিরিয়ে দেবো।'

দাদা বললে, 'পাগল হয়েছিস? ফিরিয়ে আবার দেয় নাকি কখনও! কার টাকা তুই বুঝবি কেমন করে? মাঝখান থেকে কে-না-কে মেরে দেবে। তার চেয়ে এক কাজ কর্।'

বললাম, 'কি কাজ?'

দাদা একটুখানি হেসে বললে, 'আড়াই-শ' তুই নে, আড়াই-শ' আমাকে দে।'

কিন্তু তা আমি দিলাম না। মণিব্যাগ্ থেকে খুচ্রো টাকা ক'টি বের করে' নিয়ে, তাই দিয়ে দৈনিক খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম।

'গত শনিবার সন্ধ্যায় শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের উপর আমি একটি মণিব্যাগ কুড়াইয়া পাইয়াছি। যিনি এই মণিব্যাগের মালিক, তাঁহাকে সেটি আমি ফিরাইয়া দিতে চাই। কি রকম মণিব্যাগ এবং তাহার মধ্যে কি কি আছে যিনি বলিতে পারিবেন, তাঁহাকেই উহা আমি ফিরাইয়া দিব।'

বিজ্ঞাপন পড়ে বুড়ো এক ভদ্রলোক কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হলেন। বললেন, 'মেয়ের বিয়ের জন্যে বাড়ী বন্ধক রেখে টাকা-ক'টি এনেছিলাম বাবা, তোমায় কি বলে' যে আশী-র্ব্বাদ করবো...'

যাই হোক, তাঁর কথা শুনে বুঝলাম, মণি-ব্যাগটি তাঁরই।

টাকা সমেত ব্যাগটি তাঁর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম,

'বিজ্ঞাপনের জন্যে চারটি টাকা খরচ করেছি।'

'বেশ করেছ বাবা, খুব ভাল কাজ করেছ। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি বাবা, তোমার অর্থের অভাব জীবনে যেন

কোনোদিন না হয়।—কিন্তু বাবা, আমার একটি জিনিষ তোমায় নিতে হবে।'

এই বলে' তিনি তাঁর মণিব্যাগটি খুলে সেই সোনার আংটি-টি বের করে' আমার হাতের আঙুলে পরিয়ে দিলেন। বললেন, 'এর চেয়েও অনেক কিছু বেশি তোমায় আমার দেওয়া উচিত বাবা, কিন্তু—'

দেখলাম তাঁর চোখ দিয়ে দর্ দর্ করে' জল গড়িয়ে এসেছে।

এই পর্য্যন্ত বলে' স্থকুমার আমার মুখের পানে তাকালে। বললে, 'সেই থেকে সেই ভদ্রলোকের দেওয়া আংটি-টি আমার হাতেই ছিল। যতবার সেই আংটি-টির দিকে তাকাতাম, মনে হ'তো, যে-লোভ মানুষের পরম শত্রু সেই লোভকে আমি জয় করেছি।

ভাল কাজ করবার স্থযোগ মানুষের জীবনে খুব কমই আসে, আমার জীবনে এসেছিল মাত্র ওই একটিবার।—তারপর কি হ'লো শোন!'

বলেই সে আর-একটি গল্প বল্‌তে আরম্ভ করলে। বললে—

'পাঁচ বছর পরের ঘটনা।—এই সেদিন। এই পাঁচটি বছরের মধ্যে অনেক ঝড়-ঝাপ্‌টা আমার মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। বাবা মারা গেছেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর

ঋণের দায়ে আমাদের এত বড় বাড়ীখানি বিক্রি করতে হয়েছে। সংসারে আমাদের লোকজন বড় কম নয়। বিধবা পিসিমা, বিধবা দুই বোন্, বোনেদের ছেলেমেয়ে, ছোট ছোট তিনটে ভাই, তার ওপর দাদার একটি মস্ত সংসার। ভাড়াটে-বাড়ীতে বাস করছি। অভাবের আর অন্ত নেই।

দাদা বললে, 'একটা চাকরির চেষ্টা ছাখ্ সুকুমার।'

তাই আমায় করতে হলো। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে দেখে কত যে দরখাস্ত করলাম তার ঠিক নেই। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আপিসে আপিসে টো টো করে' ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। রোদে ঘুরে বেড়াতে কষ্ট হয়। দাদাকে বললাম, 'একটা ছাতা কিনে দাও দাদা!'

দোকানে ছাতা কিনতে গিয়ে দাদা বললে, 'এখন বুঝছিস্ ত' সুকুমার, সেই যে সেই পাঁচশ' টাকা তখন যদি ভালোমানষী করে' না ফিরিয়ে দিতিস্ ত' আজকে আর ভাবতে হ'তো না। স্বাধীনভাবে যাহোক্ একটা কিছু ব্যাবসা-ট্যাব্‌সা করতে পারতিস্।'

দাদাকে কিছু বলতে পারলাম না। মনে-মনেই হাসলাম। এখন সে টাকাটা পেলে সত্যিই ফিরিয়ে দিতাম কি না তাই-বা কে জানে!

যাই হোক্, নতুন ছাতি মাথায় দিয়ে চাকরির সন্ধান করতে

থাকি, আর ভাবি, কেমন করে' কিছু রোজগার করা যায়। দাদা যা মাইনে পান তাই দিয়ে কি কষ্টে যে আমাদের সংসার চলে তা ত' স্বচক্ষেই ছ'বেলা দেখতে পাই, দাদার কষ্ট হয় বুঝতে পারি, অথচ নিরুপায়।

সেদিন বেলা তখন প্রায় ছুটো। আপিসের এক বড়বাবু তিনটের সময় দেখা করতে বলেছেন। হেঁটে হেঁটে সেইখানেই চলেছি। ভয়ানক পিপাসা পেয়েছে, অথচ রাস্তার কলে তখনও জল আসেনি। ভাবলাম একটা পান খাই। পথের ধারে একটা দোকানে দাঁড়িয়ে পান কিনছি, এমন সময় এক ভদ্রলোক আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। দোকানীকে বললেন, 'একটা সিগ্রেট্ দাও।'

তিনি কিনলেন সিগ্রেট্, আর আমি কিনলাম পান।

দোকান থেকে কয়েক্-পা মাত্র এগিয়ে গেছি, সেই ভদ্রলোকও আমার পাশাপাশি পথ চলছিলেন, সিগ্রেটে একটা টান্ দিয়ে আমার মুখের পানে তাকিয়ে বললেন, 'এই দোকান থেকে পান কিন্‌লেন কিন্তু পান ও-ব্যাটা ভালো সাজ্‌তে জানে না। পান যদি কোনোদিন খান্ ত' ওই যে ওই জলের কলটা দেখছেন, ওরই পাশ দিয়ে ওই যে গলিটা বেরিয়ে গেছে, ওই গলির মাথায়—'

রাস্তার মাঝখানে থম্‌কে দাঁড়িয়ে আঙুল বাড়িয়ে তিনি আমায় গলিটা দেখাচ্ছিলেন। কথাটা তখনও তাঁর শেষ হয়নি এমন সময় কালো মত একটা লোক আমাদের সুমুখে রাস্তার ওপর থেকে হেঁট হয়ে কি যেন কুড়িয়ে নিয়ে হন্ হন্ করে' চলে গেল।

লোকটা কি যে কুড়িয়ে পেলে বুঝতে পারলাম না, তবে ব্যাপারটা আমাদের চোখ এড়ালো না। তিনিও দেখলেন, আমিও দেখলাম।

যাই হোক্, ভদ্রলোক আবার তাঁর নিজের কথার জের টেনে বলতে লাগলেন, 'ওইখানে একটা দোকান আছে, লোকটা পান সাজে ভারি চমৎকার। একদিন অন্ততঃ খেয়ে দেখবেন। জীবনে আর ভুলতে পারবেন না।'

বললাম, 'পান আমি বড়-একটা খাইনা। হঠাৎ আজ ইচ্ছে হ'লো, তাই……'

এই বলে' আমিও চলছি, তিনিও চলছেন।

এমন সময় এক মাড়োয়ারী-ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে আমাদের কাছে এসে থম্‌কে দাঁড়ালেন।—'হ্যাঁ মশাই, আমার একটা জিনিষ আপনারা কুড়িয়ে পেয়েছেন—এই রাস্তার ওপর? হ্যাঁ, ঠিক্ এইখানে—এইখানে দাঁড়িয়েই…' বলে' তিনি রাস্তার দিকে কেমন যেন হতাশ হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

বললাম, 'আমরা পাইনি, তবে একটা লোক কি যেন কুড়িয়ে পেলে বলে' মনে হ'লো।'

'লোকটা কোন্ দিকে গেল বলতে পারেন? কি রকম লোক, দেখে কি আর তাকে চিনতে পারব?'

ভদ্রলোক অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন দেখলাম। বললাম, 'কালো মত লোকটা, গায়ে একটা সাদা গেঞ্জি পরে' আছে, এইদিকে গেল বলে' মনে হচ্ছে।'

আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না না এদিকে ত' যায়নি, এইদিকে গেল আমি দেখলাম।'

বলে' তিনি আঙুল বাড়িয়ে ঠিক তার উল্‌টো দিকটা দেখিয়ে দিলেন।

মাড়োয়ারী-ভদ্রলোক সেই দিকেই ছুটলেন!

বললাম, 'না মশাই, আপনি ভুল বললেন, আমার মনে হ'লো এইদিকে গেল।'

তিনি বললেন, 'যে দিকেই যাক্ না দাদা, আমাদের কি! ও ধনী লোক, ওর অনেক আছে, আর যে পেয়েছে সে হয়ত' গরীব মানুষ, পাক্ না একটা-আধটা টাকা!'

পথ চলতে চলতে আমরা মোড়ের মাথায় এসে দাঁড়ালাম। অনেকগুলো গাড়ী পার হচ্ছিল। বাধ্য হয়েই দাঁড়াতে হ'লো।

'এই ব্যাটা এই, শোন্! শোন্!'—দেখলাম হাতের ইসারায় তিনি কাকে ডাকছেন।—'দেখুন ত' ওই লোকটা, না?'

দেখলাম, গেঞ্জি গায়ে সেই কালোমত লোকটিই বটে! তাঁর ডাক শুনে সে আমাদেরই দিকে এগিয়ে আসছে।

কাছে এসে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, 'কই দেখি তুই কি কুড়িয়ে পেলি?'

পথের মাঝখানে এই এতগুলো লোকের সুমুখে জিনিষটা দেখাতে সে চাইলে না। বললে, 'আসুন বাবু, একটুখানি আড়ালে আসুন!'

আমরা দু'জনেই তার পিছু পিছু গিয়ে একটা গলির ভেতর ঢুকলাম। গলিতে লোকজন নেই। একেবারে নির্জ্জন বললেই হয়।

অতি সন্তর্পণে লোকটা দেখালে—কাগজে মোড়া লম্বা লম্বা দুটো গিনি-সোনার বার্! সোনাটা হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে একবার দেখলাম। তা প্রত্যেকটার ওজনও নেহাৎ কম নয়। কুড়ি পঁচিশ ভরি ত' হবেই।

আমার সঙ্গীটি বললেন, 'তুই এ দুটো নিয়ে কি করবি বল্ দেখি? তার চেয়ে এক কাজ কর্। আমাদের দু'জনকে দুটো দিয়ে দে। আমাকে একটা দে, আর এই বাবুকে একটা।'

'না বাবু।' বলে' সোনার জিনিষ দুটো সে একরকম জোর করেই তাঁর হাত থেকে তুলে নিলে।

তিনি বললেন, 'আরে, আমরা অম্‌নি নিতে চাই না। কিছু টাকা তোকে আমরা দিচ্ছি। না কি বলেন মশাই ?'

বলেই তিনি আমার মুখের পানে তাকালেন। তাকিয়েই হাসতে হাসতে বললেন, আর না যদি দিবি বাবা ত' এই হাতের কাছেই পুলিশ থানা, তোকে ধরিয়ে দিতে আর কতক্ষণ !'

লোকটা পুলিশের ভয়েই বোধকরি রাজি হ'লো ; বললে, 'তা আপনাকে না-হয় একটা দিতে পারি বাবু, কিন্তু ওই ওঁকে কেন দেবো ?'

আমার সঙ্গীটি বললেন, 'বা-রে, উনিই ত' আগে দেখেছেন। ওঁকে একটা দিতে হবে বই-কি ! আর অম্‌নি ত' নেবেন না, কিছু টাকা দিয়েই নেবেন।'

আমার পকেটে কিন্তু খুচরো কয়েক আনা পয়সা মাত্র সম্বল। ভদ্রলোককে একটুখানি দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁর কানে-কানে বললাম, 'টাকা কিন্তু আমার সঙ্গে নেই।'

ভদ্রলোক কি যেন ভাবলেন, ভেবে বললেন, 'কিন্তু সোনার দর জানেন ত' আজকাল ?'

ঘাড় নেড়ে বললাম, 'তা জানি।'

'তবেই ভেবে দেখুন, জিনিষদুটো ছাড়া কি উচিত ? আচ্ছা, আসুন ত', আমার সঙ্গে টাকা কিছু আছে।'

এই বলে' তিনি তার কাছে আবার এগিয়ে গেলেন।

বললেন, 'দে জিনিষ দুটো!' বলেই তিনি জিনিষ দুটো তার হাত থেকে নিয়ে একটা নিজের পকেটে রাখলেন, আর একটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'রাখুন।'

তারপর তিনি তাঁর পকেট থেকে কয়েকটা টাকা বের করে' তার হাতে দিয়ে বললেন, 'নে বাপু, এই ক'টা টাকা এখন আছে আমাদের কাছে, আর কিছু নেই। যা চলে যা।'

টাকা ক'টা হাতে নিয়ে লোকটা বললে, 'কত টাকা?'

তিনি বললেন, 'ষোলো টাকা।'

সে ঘাড় নেড়ে বললে, 'আজ্ঞে না, তা আমি দেবো না। একটা তাহ'লে আমায় ফিরিয়ে দিন।'

'হ্যাঁ, ফিরিয়ে দেবে না আরও-কিছু!' বলে' তিনি আমার মুখের পানে তাকালেন। বললেন, 'আপনার কাছে কিছু নেই? আচ্ছা—দিন্ আপনার ওই আংটিটা খুলে দিন, ব্যাটা চলে যাক্।'

এই বলে' তিনি আমায় আর কোনোরকম ভাববার অবসর না দিয়েই আমার হাত থেকে আংটিটা খুলে নিয়ে তার হাতে দিয়ে বললেন 'হ'লো ত' এবার? যা ব্যাটা যা, অনেক হয়েছে।'

লোকটা কিন্তু তখনও খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগলো। বললে, 'দিন্ বাবু, এই ছাতাটাও দিন তাহলে।' বলেই সে আমার হাত থেকে নতুন ছাতিটা একরকম কেড়ে নিয়েই চলে গেল।

সঙ্গী ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন, 'যান্ মশাই, আজ অনেক লাভ হয়ে গেল। কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলেন কে জানে।'

কি জানি, কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলাম আমারও ঠিক মনে নেই। সেদিন আমার আর আপিসের সেই বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করা হ'লো না। বাড়ী ফিরে গেলাম। যাক্, পঁচিশ ভরি না থাক্ অন্ততঃ বিশ ভরিও ত' আছে। সংসারের অনেক দুঃখ হয়ত' লাঘব হ'লো।

আপিস থেকে দাদা ফিরে এলো। সোনাটা তাকে দেখিয়ে বললাম, 'এই ছাখো দাদা, আজ অনেক কিছু লাভ করেছি!'

দাদা ত' আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। বললে, 'যাক্, এবার মালিককে ওটা ফিরিয়ে যে দিস্‌নি এই যথেষ্ট! চল্ একটা জানাশোনা পোদ্দারের দোকানে ওটা বিক্রি করে' দিয়ে আসি।'

'চল।' বলে আমারা দু'-ভাইএ বেরিয়ে পড়লাম। পথে যেতে যেতে ঠিক হ'লো, চাকরি আমি আর করব না। এই টাকা দিয়ে যে কোনও একটা কারবার করলেই চলবে।

দাদা বললে, 'তোর ধন-প্রাপ্তি যোগ আছে দেখছি। এমনি করে' পরের জিনিষ পেয়ে পেয়েই একদিন হয়ত' তুই বড়লোক হয়ে যাবি।'

সোনার বার্‌টা নেড়ে-চেড়ে দেখে পোদ্দার তার কষ্টি-পাথর বের করলে, পাথরের ওপর বেশ ভাল করে' বারকতক্ কষে' য়্যাসিড্ দিয়েই হো হো করে' হেসে উঠলো। সোনার বারটা আমাদের পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, 'পেতোল্।'

আমার বুকের ভেতরটা ধ্বক্ করে' উঠলো। দাদার মুখখানি গেল শুকিয়ে!

হাতের আঙুলটির দিকে তাকালাম! আংটির সাদা দাগ তখনও জ্বল্ জ্বল্ করছে। হায় হায়, সর্ব্বনাশা যে-লোভকে

জয় করে' আংটি-টি আমি পেয়েছিলাম, আজ সেই লোভের কাছে পরাজিত হয়েই সেটি আমার গেল।

সুকুমারের গল্প এইখানে শেষ হ'লো।

আমি আর না হেসে থাকতে পারলাম না। বললাম, 'ছাতিটা বুঝি ফাউ?'

ঠোঁটের ফাঁকে শুক্‌নো একটুখানি হেসে সুকুমার বললে, 'হাঁ, ভাল নতুন ছাতি। মাসখানেক্‌ আগে দাদা আমায় কিনে দিয়েছিল।'
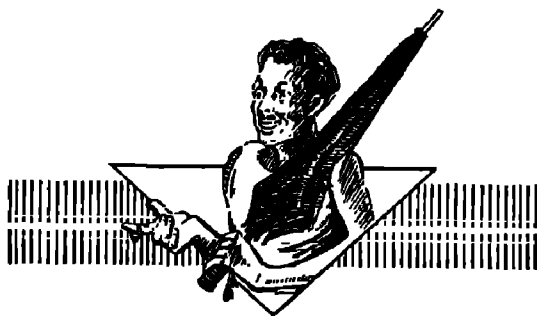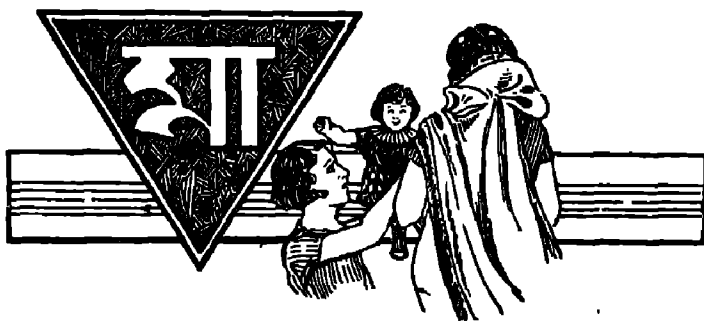
বাণী তখন মাত্র ছ'বছরের মেয়ে, সেই সময় তার মা গেল মরে। মরলো হাঁসপাতালে।

বাড়ীতেই হয়তো মরতো, কিন্তু বাণীর বাবা বড় গরীব। কোথায় কোন্ আপিসে চাকরি করে। তিরিশটি টাকা মাইনে পায়। তিরিশ টাকায় কলকাতার মত শহরে সংসার তার চলে না। এমন দিনে বাণীর মা'র হ'লো অসুখ।

অসুখ যখন খুব বেশি, সবাই তখন বলতে লাগলো—ডাক্তার দেখাও, নইলে ও বাঁচবে না।

কিন্তু ডাক্তার সে দেখাবে কেমন করে? ওষুধের দাম ত' আছেই, তার ওপর ডাক্তার যদি ডাকে ত' তক্ষুনি তাকে চারটি টাকা দিতে হবে। একবারের বেশি ছ'বার ডাকলেই আট টাকা। তার চেয়ে কাজ নেই—বাণীর বাবা ভাবলে, গরীবের হাঁসপাতাল আছে, সেখানেই যাওয়া যাক্।

একদিন সকালে বাণীর বাবা একটি রিক্‌শা-গাড়ী ডেকে নিয়ে এলো। বাণীর মাকে গিয়ে বললে, 'চলো, হাঁসপাতালে একবার দেখিয়ে আনি।'

দু'বছরের মেয়ে বাণীকে সঙ্গে নিয়ে বাণীর মা গেল হাঁসপাতালে।

ডাক্তার দেখলে। দেখে বললে, 'এখানে কিছুদিন থাকতে হবে।'

কিন্তু মুস্কিল হ'লো বাণীকে নিয়ে। বাণীকে তা'রা হাঁস-পাতালে তার মা'র কাছে কিছুতেই থাকতে দেবে না।

সে কথা ভাবতে ভাবতে তা'রা ফিরে এলো।

তাদেরই পাশের বাড়ীতে থাকে নরেনবাবু। নরেনবাবু আর তার স্ত্রী। ছেলেপুলে তাদের হয়নি। বাড়ীতে ঠাকুর আছে, চাকর আছে, চাকরাণী আছে, অভাব তাদের কিছুই নেই। অভাব শুধু একটি ছেলের। ছেলে অভাবে বাড়ী তাদের খাঁ খাঁ করে। নরেনবাবুর স্ত্রী মহামায়ার মনে কোনও সুখ নেই। দিনরাত মন-মরা হ'য়ে ঘুরে বেড়ায়।

হাঁসপাতাল থেকে ফিরে এসেই বাণীর মা এলো মহামায়ার কাছে। রোগা ছিপ্‌ছিপে মেয়েটি, অসুখ হ'য়ে অবধি আরও রোগা হয়ে গেছে।

মহামায়া বললে, 'হাঁসপাতালে গিয়েছিলে না? কি হ'লো? ডাক্তারেরা কি বললে?'

বাণীর মা বললে, 'বললে সেখানে কিছুদিন থাকতে হবে। কিন্তু দিদি, এই মেয়েটাকে নিয়ে ভারি বিপদে পড়েছি।'

ব'লেই সে তার কোল থেকে বাণীকে সেইখানে নামিয়ে দিয়ে নিজেও বসে পড়লো। রোগা মানুষ, এত বড় মেয়েটাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকাও দায়।

মহামায়া জিজ্ঞাসা করলে, 'কেন?'

বাণীর মা বললে, 'মেয়েটাকে তা'রা আমার কাছে থাকতে দেবে না। ওকে এইখানেই রেখে যেতে হবে। কোথায় রাখব তাই ভাবছি দিদি।'

বাড়ীতে তাদের মেয়েমানুষ বলতে আর কেউ নেই। বাণীর বাবা সারাদিন থাকে আপিসে। ভাববারই কথা।

মহামায়া বুঝতে পারলে, মেয়েটিকে সে তারই কাছে রাখতে চায়। কিন্তু লজ্জায় বোধ করি মুখ ফুটে সে কথা বলতে পারছে না। তাই সে নিজেই বললে, 'তা বেশ ত,' থাক্ ও আমার কাছে। তুমি যাও হাঁসপাতালে।'

বাণীর মা'র মুখে হাসি ফুটল। বড় বড় ঢলঢলে চোখ দুটি তার জলে ভরে এলো।

বাণীকে মহামায়া তার কোলের কাছে টেনে এনে বললে, 'আমার কাছে থাকতে পারবি ত' মা?'

বাণী ঘাড় নেড়ে বললে, 'হুঁ।'

'তাহ'লে কালই সকালে আমি চলে যাব দিদি।'

মহামায়া বললে, 'হ্যাঁ, যাও।'

বাণী রইলো মহা-মায়ার কাছে। বাণীর মা গেল হাঁসপাতালে। যাবার সময় সে কী তার চোখের দৃষ্টি!

মহামায়াকে প্রণাম করে তার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বাণীর মা বললে, 'যদি আমি আর ফিরে না আসি দিদি, বাণীকে তুমি নিও।'

বলতে বলতে ঠোঁট দুটি তার থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলো। চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়লো।

মহামায়া বললে, 'ছি ও কি কথা!'

তারপর রিক্‌শা গাড়ীর পিছনের পর্দ্দা সরিয়ে যতক্ষণ দেখা গেল বাণীর মা তার সেই জলভরা চোখদুটি নিয়ে তাকিয়ে রইলো মহামায়া আর বাণীর দিকে।

রিক্‌শা-গাড়ীটা যখন মোড়ের বাঁকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল, বাণী তখন জিজ্ঞাসা করলে, 'আমরা কখন্ যাব জ্যাঠাই-মা?'

বাণীকে বোঝানো হয়েছিল, মা তার গঙ্গাস্নান করতে যাচ্ছে। গঙ্গায় বড় বড় অনেকগুলো কুমীর উঠেছে, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দেখলেই তাদের খেয়ে ফেলছে, তাই বাণীকে সে সঙ্গে নিয়ে গেল না। তা না যাক্, আজই সন্ধ্যাবেলা তা'রা মোটরে চড়ে থিয়েটার দেখতে যাবে।

মহামায়া বললে, 'আমরা স্নান করে খেয়ে নিই, খেয়ে এক ঘুম ঘুমিয়ে সাবান মেখে গা ধুয়ে ভাল ভাল কাপড় জামা পরে মোটরে চড়ে থিয়েটার দেখতে যাব।'

বাণী—দিব্যি ফুট্‌ফুটে চমৎকার মেয়েটি!

মহামায়া ভাবে, এম্‌নি যদি তার একটি হ'তো! বলে, 'আমাকে আর জ্যাঠাইমা বোলো না বাণী, আমাকে মা বলে' ডেকো। ও মা'টা ভালো নয়।'

বাণী বলে, 'হুঁ, ভালো না।'

বাজার থেকে বাণীর জন্যে ভাল ভাল জামা এলো, জুতো

এলো। নরেন বললে, 'ছ'দিনের জন্যে কেন মিছিমিছি আনলে ও-সব ?'

মহামায়া হাসতে লাগলো। বললে, 'আহা, গরীবের মেয়ে······পরুক্ !'

মহামায়ার মুখে আগে কেউ হাসি দেখতে পেতো না। বাণী আসবার পর থেকে সে হাসছে।

এ-ক'দিন মহামায়া তার সব কাজ ফেলে দিবারাত্র বাণীকে নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে আছে। বাণীকে সাবান মাখাচ্ছে, পাউডার মাখাচ্ছে, জামা পরাচ্ছে, জুতো পরাচ্ছে, সাজিয়ে গুজিয়ে বিকেলে মোটরে চড়ে বেড়াতে যাচ্ছে, বায়োস্কোপ দেখছে, থিয়েটার দেখছে।

মহামায়াও সব-কিছু ভুলেছে, বাণীও তার মাকে ভুলেছে।

বাণী যে তার মা'র নাম আর মুখেও আনে না, এইতেই মহামায়ার আনন্দের আর সীমা নেই। মহামায়াকে আজকাল সে 'মা' বলে ডাকে, নরেনকে বলে—বাবা।

হাঁসপাতালে গিয়ে বাণীর মা প্রথম প্রথম কিছু ভালই ছিল। ভরসা হয়েছিল সে বাঁচবে। কিন্তু প্রায় মাসখানেক পরে বাণীর বাবা একদিন হাঁসপাতাল থেকে ফিরে এসে জানালে যে, অবস্থা তার ভাল নয়। বাণীকে একটিবার সে দেখতে চেয়েছে।

মহামায়ার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। মাকে সে দিব্যি ভুলেছিল, আবার দেখলেই তার মনে পড়বে। আবার হয়ত' মেয়েটাই তাহ'লে মা'র জন্যে কান্নাকাটি করবে।

নরেন বললে, 'তুমি না হয় মেয়েটাকে কোনোরকমে ভুলিয়ে রেখেছ, কিন্তু আহা, মা তার কেমন করে থাকে বল ত? চল—আজ একবার দেখিয়ে আনি।'

পরের দিন বিকালবেলা বাণীকে বেশ করে সাজিয়ে মোটরে চড়ে তা'রা হাঁসপাতালে গেল বাণীর মাকে দেখতে।

আহা, মেয়েটাকে দেখলে আর চেনবার জো নেই। কঙ্কালসার হ'য়ে বিছানার সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে।

বাণীকে দেখেই চোখ দিয়ে তার দর্ দর্ করে জল গড়াতে লাগলো। উঠে একবার বসবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না।

মহামায়া বললে, 'থাক্, তুমি উঠো না। বাণী আমার কাছে বেশ ভালই আছে। আমাকে মা বলে ডাকে।'

বাণী তার মাকে এমন অবস্থায় এখানে পড়ে থাকতে দেখে প্রথমে খানিকক্ষণ অবাক্ হ'য়ে তার মুখের পানে চেয়ে রইলো, তারপর তার শিয়রের কাছটিতে চুপ করে খানিকক্ষণ বসে থেকে কি যে ভাবলে কে জানে, মহামায়াকে বললে, 'চল মা, বাড়ী চল।'

বাণীর মা আবার বাণীর মুখের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে একটি হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে অতিকষ্টে ধীরে-ধীরে বললে, 'আমায় ভুলে গেছিস্ বাণি?'

বলতে বলতে নীচেকার ঠোঁটটি তার থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলো, চোখ দিয়ে আবার জল গড়িয়ে এলো।

সে কান্না দেখে অতি বড় পাষাণেরও বুক ফেটে যায়। মহামায়াও কেঁদে ফেললে।

এমনি করে দু'চার কথা হ'তে হ'তেই ঘণ্টা পড়লো। রোগীদের সঙ্গে যা'রা দেখা করতে এসেছে, এবার তাদের চলে যেতে হবে।

বাণীর মা'র মুখ-চোখ দেখে মনে হ'লো—সে যেন এদের ছেড়ে দিতে চায় না, তবু দিতে হবে ছেড়ে। থাকবার উপায় নেই।

বাণীর মা তেমনি কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'আবার এসো দিদি!'

মহামায়া বাণীকে কোলে তুলে নিয়ে বললে, 'আসব।'

তা'রা পিছন ফিরে চলে এলো, আর বাণীর মা হাঁসপাতালের সেই খাটের ওপর শুয়ে শুয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো তাদের দিকে। ওঠবার শক্তি নেই যে, উঠে দেখে। তার ওপর পোড়া চোখের জলে ভাল দেখাও গেল না।

হাঁসপাতাল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে মোটরে চড়ে' বাণী বললে, 'ও মা'টা ভালো নয়। না মা?'

নরেনকে শুনিয়ে মহামায়া বললে, 'শুনছো কি বলছে?'

নরেন বললে, 'মরে যদি যায় ত' বড় হয়ে ওই মায়ের জন্যেই কেঁদে সারা হবে।'

মহামায়াও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

বাণীর মাকে মহামায়া বলে এসেছিল—আবার আসব। কিন্তু আজ যাই কাল যাই করে যাওয়া আর হ'য়ে উঠছিল না।

চারদিন পরে সেদিন রবিবার। সকালে খাবার নিয়ে বাণীর বাবা রোজ যেমন হাঁসপাতালে যায়, সেদিনও তেমনি গিয়েছিল, ফিরে এলো কাঁদতে কাঁদতে। খবর নিয়ে এলো—কাল রাত্রি দেড়টার সময় বাণীর মা মরে গেছে।

পাড়ার জনকয়েক্ লোকজন ডেকে নিয়ে নরেন গেল শ্মশানে।

মহামায়া তার চোখের জল মুছে, বাণীকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।—ছি ছি, যাব বলে' সে আর গেল না। সেই যাওয়াই তার শেষ যাওয়া। হাঁসপাতালে মরেছে রাত্রি দেড়টার সময়। বাণীকে হয়ত সে একবারটি শেষ দেখা দেখতে চেয়েছে,

বাণীর বাবাকে দেখতে চেয়েছে, কিন্তু মরবার সময় কাউকে সে দেখতে পেলে না। পিপাসায় হয়ত, তার গলা শুকিয়ে গেছে, এক ফোঁটা জলও কেউ দিয়েছে কি না কে জানে। এমন সুন্দর তার এই মেয়েটিকে ছেড়ে, স্বামীকে ছেড়ে, মরতে হয়ত সে চায়নি। কত উদ্বেগে, কত ছট্‌ফট্‌ করে প্রাণ যে তার বেরিয়েছে—হে ভগবান, বাণীকে না নিয়ে যাওয়ার জন্যে তার যদি কোনও অপরাধ হ'য়ে থাকে ত' তাকে ক্ষমা কর।

শবদাহ করে' শ্মশানবন্ধুরা ফিরে এলো বৈকালে। বাড়ীতে চীৎকার করে কাঁদবার কেউ নেই। বাণীর বাবা শুধু তার শূন্য ঘরের মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে ফুলে ফুলে ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদতে লাগলো।

বাণীকে কিছুই জানতে দেওয়া হ'লো না। সে তখন তার পুতুল নিয়ে আপন মনেই খেলা করছে। মস্ত বড় খোকাপুতুলটা তার বড় দুষ্টু। ভারি কাঁদে। কোলে নিয়ে নাচিয়ে নাচিয়ে তাকে চুপ করাতে হয়।

মহামায়া ঘরে ঢুকতেই বাণী তার খোকাকে কোলে নিয়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বললে, 'কিছুতেই একে চুপ করাতে পারছি না মা, তুমি চুপ করিয়ে দাও!'

মহামায়া ম্লান একটুখানি হেসে তার সঙ্গে খেলা করতে বসলো।

দিনকতক পরে হঠাৎ একদিন ঘুম থেকে জেগে উঠেই বাণী
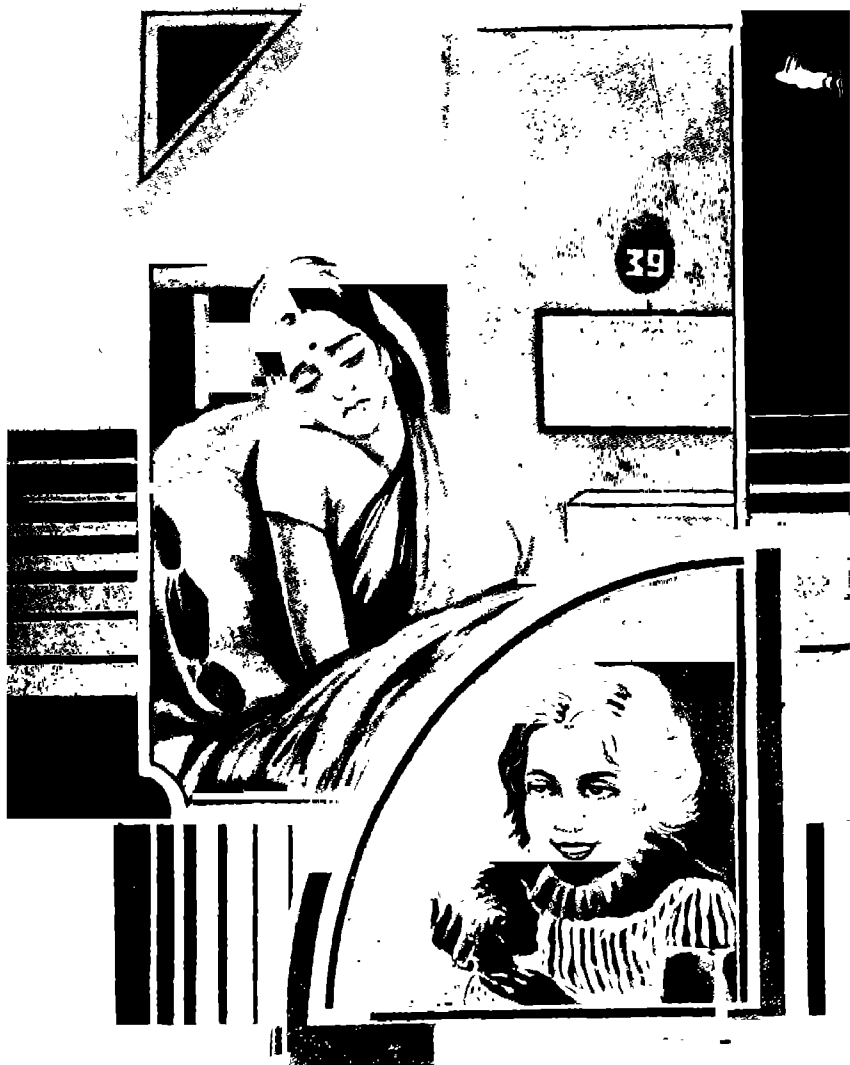
ব কাঁদতে আরম্ভ করলে। বিকেল বেলা! মহামায়া তখন গা ধুয়ে কাপড় কেচে ঘরের কাজকর্ম্ম সারছে। বাণীকে কোলে তুলে নিয়ে বললে, 'এত কান্না কেন মা? চল তোমার গা-হাত মুছিয়ে ভাল জামা পরিয়ে দিই।'
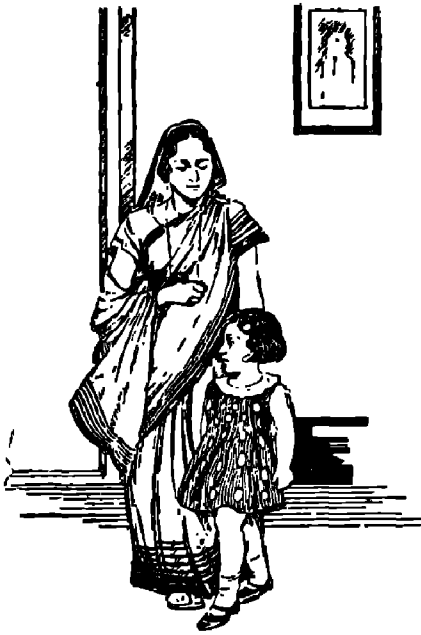
বাণী কিন্তু কিছুতেই চুপ করে না। খালি কাঁদতে থাকে।

জামা পরিয়ে, জুতো পরিয়ে দিয়ে মহামায়া তার চোখ মুছিয়ে বললে, 'এখনও কান্না!'

বাণী বললে, 'বেড়াতে চল—মোটরে চেপে।'

'বেশত', তাই বললেই হয়!'

মহামায়া তার চাকর-টাকে ডেকে বললে, 'একটা গাড়ী ডেকে আন্ ত' বাবা!

চাকরটা ট্যাক্সি ডাকতে গেল।

বাণী বললে, 'মা'র কাছে চল—সেই যে সেই খাটের ওপর শুয়ে আছে!'

সর্ব্বনাশ। মহামায়ার বুকের ভেতরটা কেমন যেন ক'রে উঠলো। মেয়েটাকে কি বলে বোঝাবে কিছুই বুঝতে পারলে না। বললে, 'সেখানে গিয়ে কি হবে মা, সেখানে যেতে নেই।'

বাণীর কান্না তাতে আরও যেন বেড়ে গেল। কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'না। আমি সেই মা'র কাছে যাব।'

মা বেঁচে থাকতে হতভাগী এমন করে একদিনও যেতে চায়নি।

মহামায়া অনেক করে তাকে বুঝিয়ে বললে। ভোলাবার অনেক চেষ্টা করলে কিন্তু সেদিন কি যে তার হ'লো, কিছুতেই যেন ভুলতে চায় না!

মহামায়া বললে, 'এই যে আমি তোমার মা বাণী, কেন, আমাকে কি তোমার ভাল লাগছে না?'

বাণী কিন্তু সেই এক জিদ ধরে রইলো—'না, আমি সেই মা'র কাছে যাব।'

এত যত্ন, এত আদর—এই যে তার 'মা' বলা, এ সবই কি তাহ'লে বৃথাই হ'লো?'

মেয়েটার কান্না দেখে মহামায়াও আর চুপ করে থাকতে পারলে না। তারও এম্‌নি ছোটবেলায় মা মরে গেছে। মহামায়ার চোখেও জল এলো।

বাণীও যত কাঁদে, মহামায়াও তত কাঁদে।

শেষে বোধ করি আর কোনও উপায় না দেখে, মহামায়া বললে, 'সে মা তোর মরে গেছে বাণী, সে আর নেই।'

বাণী কি যে বুঝলে কে জানে, মহামায়ার মুখের পানে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কান্না থামিয়ে সে বললে, 'হ্যাঁ, মরে গেছে। সে মা'টা ভালো নয়। ছাই।'

মহামায়া যেন একটুখানি নিশ্চিন্ত হ'লো।

খানিক্ পরেই দেখা গেল, বাণী তার কোলের ওপরেই আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘুমোক্।

যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে ততক্ষণই ভালো।

কিন্তু মা-হারা মেয়ে, আবার কখন্ যে তার মাকে চেয়ে বসবে কে জানে। মহামায়া শুধু এই ভয়েই সারারাত চম্‌কে চম্‌কে উঠতে লাগলো। পাখীর মা ডানা দিয়ে তার বাচ্চাটিকে যেমন করে আগ্‌লে রাখে, বাণীকেও তেম্‌নি মহামায়া তার বুকের কাছে জড়িয়ে ধরেও নিশ্চিন্ত নিরাপদে ভাল করে ঘুমোতে পারলে না। ক্ষণে ক্ষণে শুধুই তার মনে পড়তে লাগলো, সেই রোগা ছিপ্‌ছিপে কঙ্কালসার মেয়েটির কথা—মরণের অপেক্ষায় হাঁসপাতালে শুয়ে শুয়ে যে মেয়েটি দিন গুণছিল, যার দুটি চোখের জলভরা সকরুণ চাহনি আজও তার মনে আছে! তার

চেয়ে নিজে সে বহুগুণে সুন্দরী, রূপে গুণে ঐশ্বর্য্যে তার চেয়ে সে সব রকমেই বড়, তা সত্ত্বেও বাণী আজ শুধু তাকেই চালে চিরদিন হয়ত, শুধু তাকেই সে চাইবে। মহামায়া যেন শুধু দু'দিনের তরে তার মা সেজে বসে আছে। সে হয়ত, তা'র মায়ের প্রতিনিধি হ'তে পারে, কিন্তু মা নয়।

বাণীর ঘুমন্ত মুখের উপর মহামায়া একটি চুমু খেয়ে চোখ বুজে চুপ করে পড়ে রইলো।
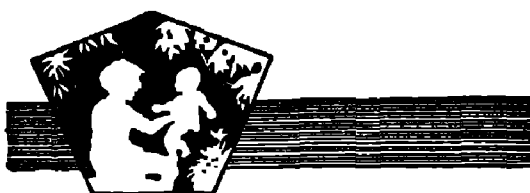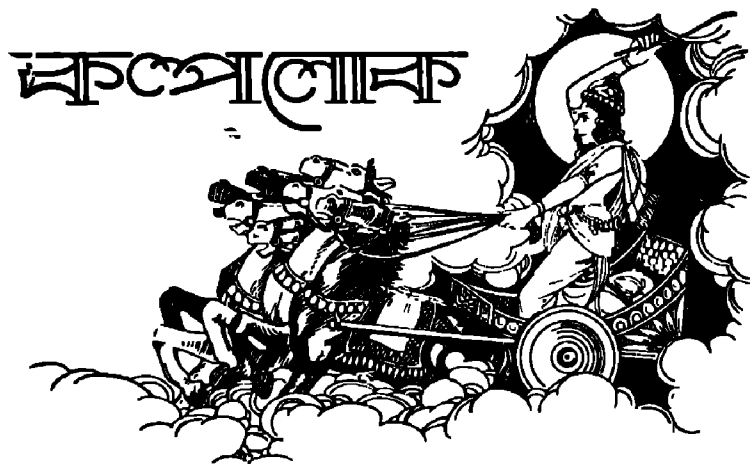
তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী আদালতে ওকালতি করেন। কিন্তু ওকালতি ভাল চলে না।

বার-লাইব্রেরীতে প্রায়ই দেখা যায়—হয় তিনি বসে বসে ঘুমোচ্ছেন, আর নয় ত' কারও সঙ্গে ঝগড়া করছেন।

ঝগড়া করবার কারণ অনেক।

প্রথম কারণ—তাঁর গায়ের রং ঠিক বার্নিশ-করা জুতোর মত কালো। তাই বন্ধু-বান্ধব তাঁর নামকরণ করেছেন—টিকেবাবু।

অথচ টিকে বললে রেগে তিনি জ্বলে যান।

বন্ধু-বান্ধবদেরও দোষ দেওয়া চলে না। কারণ তাঁদেরই

আর একজন উকিল-বন্ধুর নাম দীনেশরঞ্জন ; বন্ধুরা তাঁর নাম রেখেছেন—ডি-আর (D. R) এঁর নাম তিনকড়ি ; কাজেই টিকে (T. K) বলবার অধিকার তাঁদের আছে।

এই ত' গেল ঝগড়ার প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় কারণটা একটুখানি খুলে বলতে হয়।

যে-সব উকিলের কাজকর্ম্ম কিছু থাকে না, বসে বসে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সময় যেন তাঁদের আর কাটতেই চায় না। তাই অনেক সময় দেখা যায়, বার-লাইব্রেরীতে বসে বসে অনেকে নভেল পড়েন।

গল্প-উপন্যাস পড়লে সময়টা কাটে ভাল। অথচ এই গল্প-উপন্যাস জিনিষটা আমাদের তিনকড়ি বাবুর চু'চক্ষের বিষ! চোখের সাম্‌নে বসে বসে কেউ যদি দিব্যি আরাম ক'রে গল্প-উপন্যাস পড়বে তা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না। হয় তিনি হাত বাড়িয়ে ফট্ ক'রে বইখানা দেন বন্ধ ক'রে, আর নয় ত' হাতজোড় ক'রে বলেন, 'ও-সব গাঁজাখুরী গল্প-উপন্যাস আর পড়বেন না দাদা।'

কিন্তু কথা তাঁর কেউ শুনতে চান না।

হাতের বই বন্ধ ক'রে দিলে কেউ-বা রেগে একেবারে আগুন হ'য়ে ওঠেন, আবার কেউ-বা বলেন, 'থামো টিকে, তুমি থামো।—কেন, তোমার বৌ নভেল পড়ে না? তুমি পড়ো না?'

তিনকড়িবাবু বলেন, 'কখ্খনো না। আমার চোদ্দপুরুষে কেউ কখনও নাটক-নভেল পড়েনি। আমার বাড়ীতে ও-সব বই ঢোকবার উপায় নেই।'

গল্প-উপন্যাসের ওপর তাঁর এত রাগ!

আর এই রাগের ছুতো পেয়ে বন্ধুরা তাঁকে আরও ভাল ক'রে রাগিয়ে তোলেন।

সেদিন এমনি তিনকড়িবাবুকে ঘরে ঢুকতে দেখেই বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন মনোনিবেশসহকারে উপন্যাস পড়তে সুরু করলেন, আর একজন সুরু করলেন গল্প-উপন্যাসের দারুণ আলোচনা।

সশব্দে টেবিল চাপ্ড়ে একজন চীৎকার ক'রে উঠলেন, 'ড্যাম্ ইয়োর্ টিকেবাবু! ওঁর ভাল লাগে না বলেই দুনিয়ার লোক বুঝি গল্প-উপন্যাস পড়া বন্ধ ক'রে দেবে! গল্প-উপন্যাস ভাল লাগে না এমন লোক ত' বাবা কখনও দেখিনি!'

আর একজন বললেন, 'শরৎ চাটুজ্যের একখানি বই পেলে আমি ত' ভাই আহার-নিদ্রা ভুলে যাই।'

তিনকড়িবাবু তাঁর নির্দ্দিষ্ট চেয়ারটিতে গিয়ে বসলেন। মুখের চেহারা দেখলে মনে হয় যেন এইমাত্র তিনি কুইনিন্ খেয়েছেন। ভেবেছিলেন হয়ত' চুপ করেই থাকবেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর পারলেন না। তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর চোখের

সুমুখে যে-ভদ্রলোক রঙচঙা একখানি বই খুলে বসেছেন, সে বইখানির নাম—'পেস্তার বরফি।' লেখক—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

তিনকড়িবাবুর আপাদমস্তক জ্বলে গেল। আপনমনেই বললেন, 'বইয়ের নাম ছ্যাখো না!—'পেস্তার বরফি!'

যিনি পড়ছিলেন তিনি লাফিয়ে উঠলেন—'কি বললে? বইয়ের নাম? নামে কি এসে-যায়, একবার প'ড়ে ছ্যাখো না, মুণ্ডুটি তোমার ঘুরে যাবে।'

তিনকড়িবাবু বললেন, 'যত সব মিথ্যে কথা বানিয়ে বানিয়ে—রাবিশ! রাবিশ! ও-সব লেখে যারা' তাদের আমি ঘৃণা করি।'

একজন ব'লে উঠলো, 'কি বললে?'

'বললাম, ওই সব মিথ্যাবাদী লেখকদের আমি ঘৃণা করি।'

'পেস্তার বরফি' যিনি পড়ছিলেন, তিনি বললেন, 'আমরা তোমায় ঘৃণা করি।'

আর যায় কোথা!

এরই সূত্র ধ'রে চলতে লাগলো ঝগড়া।

তিনকড়িবাবু প্রতিপন্ন করতে চান—গল্প-উপন্যাসগুলো কিছুই নয়, শুধু মিথ্যা কথার স্তূপ, ওতে মানুষের কোনও উপকারই হয় না।

·আমরা তোমায় ঘৃণা করি !·········

অপর পক্ষ প্রতিপন্ন করতে চান—গল্প-উপন্যাসের মত ভাল জিনিষ পৃথিবীতে আর কিছুই নেই।

তিনকড়িবাবু একা। বক্‌তে বক্‌তে তিনি হায়রাণ হ'য়ে উঠলেন। শেষে তিনি হাত জোড় ক'রে বললেন, 'বেশ ভাই বেশ, আমিই হার মানছি।'

অপর পক্ষ উল্লসিত হ'য়ে উঠলো। বললে, 'নাকখৎ দাও।'

রাগ ক'রে তিনি তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন।

'যাও কোথায় ?'

'আসছি।' বলে সেই যে তিনকড়িবাবু বেরিয়ে গেলেন, সেদিন আর তাঁর দেখা মিললো না।

একে একপয়সা রোজগার নেই, তার ওপর মন খারাপ। বাড়ী ফিরেই বললেন, 'চা দাও!'

স্ত্রী তাঁর দু'টি ছেলেকে হিড়্‌হিড়্‌ ক'রে টানতে টানতে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালেন।—'এই নাও, এদের শাসন কর।'

'কেন, কি হয়েছে? কি করেছে কি ?'

'কি করেছে দেখতে পাচ্ছো না ?'

এই বলে স্ত্রী তাঁর ছোট ছেলেটির কপালটা দেখিয়ে বললেন, 'এই ছাখো!'

ছোট ছেলেটার কপালটা উঁচু হ'য়ে ফুলে উঠেছে।

তিনকড়িবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'সাবু মেরেছে বুঝি?'

বড় ছেলের নাম সাবু।

সাবু মেরেছে গাবুকে।

সাবুর বয়স পাঁচ-ছ' বছরের বেশি নয়। আর গাবু বছর-তিনেকের।

তিনকড়িবাবু ভাবলেন, ছেলেটাকে চড়িয়ে-চাপ্‌ড়িয়ে আচ্ছা ক'রে শাসন ক'রে দেন। কিন্তু না, তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে হ'লো, ছোট ছোট ছেলেদের শাসন করার চেয়ে মিষ্টি কথায় অপরাধটা বুঝিয়ে দেওয়া ভাল।

স্ত্রী বললেন, 'গাবুকে ও দেখতে পারে না। ছোট ভাইটিকে ভালবাসবে কোথায়, চব্বিশ ঘণ্টা ঝগড়া-ঝাঁটি লেগেই আছে।'

তিনকড়ি সাবুর হাতখানা চেপে ধরলেন। বললেন, 'গাবুকে নিয়ে যাও এখান থেকে। আমি দেখছি।'

স্ত্রী তাঁর গাবুকে কোলে নিয়ে চলে গেলেন।

সাবুর হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে তিনকড়িবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'গাবুকে মেরেছিস?'

সাবু মাথা হেঁট ক'রে বললে, 'হুঁ।'

তিনকড়ি বললেন, '**That's good.** সত্যি কথা বলা ভাল।'

কিন্তু বড় ভাই ছোট ভাইকে দেখতে পারে না, এটা ত'

ভাল নয়! বড় হ'য়ে চিরকাল হয়ত' তারা মারামারি লাঠালাঠি ক'রে মরবে। এই সময় এর প্রতিকারের প্রয়োজন।

সাবুকে তিনি কোলে তুলে নিলেন। নিজে বসেছিলেন চেয়ারে। ছেলেটা তাঁর পায়ের ওপর বসে টেবিলের ওপর এটা-সেটা নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

তিনকড়িবাবু তখন ভাবছেন, উপদেশটা তিনি কেমন ক'রে আরম্ভ করবেন।

কলমটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বললেন, 'কলম নিয়ে খেলা করে না, নিবটা নষ্ট হ'য়ে যাবে।—হ্যাঁ, কেন তুমি গাবুকে মেরেছ বল?'

সাবু বললে, 'গাবুও আমাকে মেরেছিল।'

'গাবু তোমার চেয়ে অনেক ছোট। সে তোমাকে মারতে পারে?'

সাবু তার বাবার মুখের পানে তাকিয়ে বললে, 'না, পারে না। কাম্‌ড়ে দেয়।'

'কিন্তু গাবু তোমার ছোট ভাই। ছোট ভাইকে আদর করতে হয়, ভালবাসতে হয়।'

এই বলে তিনি তার মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন।

সাবু বললে, 'হ্যাঁ, ভালবাসতে হয়। ও ওইটুকু ছেলে, কিন্তু

ভারি বজ্জাত, তুমি জানো না বাবা।—আচ্ছা বাবা, সেদিন বললে চিড়িয়াখানা নিয়ে যাবে, কই গেলে না ত ?'

'যাব। কিন্তু ছাখো, শুধু-শুধু কারও গায়ে হাত তুলতে নেই। কেউ যদি কাউকে মারে ত' বৃটিশ-আইন অপরাধীকে ছেড়ে দেয় না। অপরাধীর বিচার হয়। তারপর, যে মারে সে শাস্তিভোগ করে।'

সাবু তার বাবার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। কথাগুলো সে মন দিয়ে শুনছে ভেবে তিনকড়িবাবু উৎসাহিত হ'য়ে উঠলেন। তাই তিনি না থেমে আবার বলতে আরম্ভ করলেন, 'মানুষ কত পরকে ভালবাসে। আর ভাই তার সহোদর ভাইকে—'

সাবু হঠাৎ ফিক্ ফিক্ ক'রে হেসে উঠলো।

'হাসছো যে?'

সাবু বললে, 'তুমি যখন কথা বল বাবা, তখন তোমার এই-খানটা কেমন নড়ে!'

দূর ছাই।

আমার কথা তুমি শুনছো না কিছু!—তিনকড়িবাবু বললেন, 'তুমি ভারি দুষ্টু হয়েছ।'

সাবু বললে, 'একটা গল্প বল না বাবা!'

'না, গল্প শোনে না। গল্প আমি জানি না।'

'হ্যাঁ, জানো না! সেই যে সেদিন সে-ই—'

'আচ্ছা বল তুমি গাবুকে আর মারবে না।'

সাবু বললে, 'না, মারবে না! আমাকে কিস্‌কিস্ ক'রে কামড়ে দেবে, আর আমি বুঝি চুপ ক'রে থাকবো!—বল না বাবা একটা গল্প!'

'না, গল্প শুনতে নেই।'

'না তুমি বল।'

'বলছি গল্প শুনতে নেই, তবু বলে—'

'বল না বাপু, কি বলছে তাই। তোমারও যেমন!'—

তিনকড়িবাবু সুমুখে তাকিয়ে দেখলেন, স্ত্রী তাঁর চায়ের বাটি হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকছেন।

বাটিটা টেবিলের ওপর নামিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

চা দেখেই হোক্, কি অন্য কোনও কারণেই হোক্, চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে তিনকড়িবাবু বললেন, 'আচ্ছা শোনো তবে, বলছি।'

'এই বলে' তিনি আরম্ভ করলেন।

গল্প বলবার সেই চির পুরাতন ভঙ্গী! বললেন, 'এক যে ছিল রাজা!'

সাবু নড়ে চড়ে ভাল ক'রে চেপে বসলো। বললে, 'তারপর?'

'তারপর, হ্যাঁ, তারপর—'

কি যে বলবেন কিছুই তিনি জানেন না। তবু মনে-মনে তৈরি করেই বলতে লাগলেন, 'সে রাজার ছিল প্রকাণ্ড বাড়ী, হীরে-জহরৎ লোক-লস্কর, হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, বিষয়-সম্পত্তি টাকাকড়ির আর অন্ত নেই। রাজারাণীর খুব সুখ, খুব শান্তি, শুধু একটি দুঃখু—'

'কি দুঃখু বাবা?'

'বলি।' বলেই চায়ের 'পেয়ালাটা শেষ করে' দিয়ে তিনকড়িবাবু বলতে লাগলেন, 'দুঃখু এই যে, তাঁদের ছেলেদু'টি মানুষ হ'লো না। রাজার দুটি ছেলে। ঠিক এই তোমরা যেমন, সাবু আর গাবু—তেম্‌নি। ছেলেদু'টি ছোটবেলা থেকে মারামারি করে, খাওয়া-খাওয়ি করে, কেউ কাউকে দেখতে পারে না। ছেলেরা বড় হ'লো। রাজা ভাবলেন, আর আমার ভাবনা নেই, বুড়ো হ'য়েছি, এইবার ছেলেরাই সব দেখে-শুনে নিতে পারবে। কিন্তু ছেলেদু'টি বড় হ'লে কি হবে, ছেলেবেলার অভ্যেস তখনও তারা ছাড়তে পারেনি। মারামারি খাওয়া-খাওয়ি তারা করতে ছাড়ে না। একদিন কথায় কথায় দু'ভাইএর খুব ঝগড়া হ'লো। প্রথমে মুখে মুখে ঝগড়া, তারপর হাতাহাতি, তারপর লাঠালাঠি! বড় ভাই একটা লাঠি নিয়ে এসে ছোট ভাইকে এমন মার মারলে যে, ছোট ভাইয়ের মাথাটা গেল ফেটে। রক্তারক্তি খুনোখুনি

ব্যাপার! হৈ হৈ ক'রে চারিদিক থেকে লোক জড়ো হ'লো, পুলিশ এলো, কনেষ্টবল্ এলো, ছোট ভাই দিলে আদালতে নালিশ ক'রে। আদালতের বিচারে বড় ভাই দোষী সাব্যস্ত হ'লো। বাস্, বড়-ভাইয়ের হ'য়ে গেল—চার বছর জেল। রাজবাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। রাজা কাঁদলে, রাণী কাঁদলে, কিন্তু তখন আর কাঁদলে কি হ'বে!'

'তারপর?'

'তারপর এই সুযোগ বুঝে আর-একজন রাজা তখন মেলা লোকজন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বুড়ো রাজার রাজধানী আক্রমণ করলে।

'কেন বাবা?'

'লড়াই ক'রে সব কেড়ে নেবে ব'লে। বাস্, খুব যুদ্ধ চলতে লাগলো। কিন্তু রাজা তখন বুড়ো হয়েছে। বড় ছেলে নেই যে সে যুদ্ধ করবে। সে তখন জেল খাটছে। বাড়ীতে শুধু সেই ছোট ছেলেটি। একা সে কিছুতেই পেরে উঠলো না। শত্রুরা বুড়ো রাজাকে মেরে ফেললে। রাজাকে মারলে, রাণীকে মারলে, ছোট ছেলেটার একটা পা দিলে খোঁড়া ক'রে। তারপর রাজার যা কিছু ছিল,—ধন-দৌলৎ, হীরে-জহরৎ, টাকাকড়ি, হাতী-ঘোড়া, সব-কিছু লুটেপুটে নিয়ে তারা পালিয়ে গেল। একা সেই খোঁড়া ছেলেটি বসে বসে কাঁদতে লাগলো।'

'তারপর কি হ'লো বাবা?'

'তারপর? তারপর চার বছর পরে বড় ছেলে জেল থেকে খালাস পেয়ে বাড়ী ফিরে এসে দেখে—তাদের আর কিছু নেই। ছিল এত বড় রাজার ছেলে, হ'য়ে গেল একেবারে পথের কাঙ্গাল। ছোট ভাইটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দাদার কাছে এগিয়ে এলো। এসে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো, 'আমরা যদি ছেলেবেলা থেকে মারামারি না করতাম দাদা, তাহ'লে আজ আর আমাদের এ-দশা হ'তো না।'

গল্পটা আগাগোড়া মিথ্যা। মিথ্যা কথা বানিয়ে বানিয়ে ছোট ছেলের কাছে এমন ক'রে বলা বোধকরি তাঁর উচিত হ'লো না। গল্পটা শেষ করবার পর তারই একটা অস্বস্তিকর গ্লানি তিনকড়িবাবুকে বড় বেশি পীড়িত ক'রে তুলছিল, এমন সময় ছেলেটার মনে কি যে হ'লো কে জানে, অপরাধীর মত শুক্‌নো বিবর্ণ মুখে সাবু তার বাবার মুখে পানে তাকিয়ে বললে, 'আমি আর গাবুকে কখ্‌খনো মারব না বাবা!'
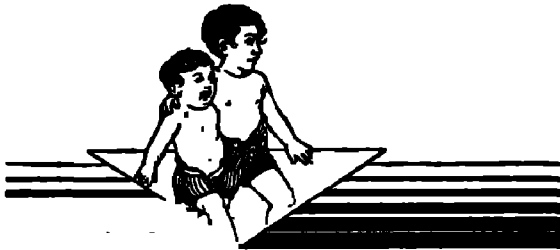
কত রকমের কত অদ্ভুত মানুষ তোমরা দেখেছ বলতে পার ?

আমি কিন্তু অনেক দেখেছি।

সেই সব অদ্ভুত মানুষের গল্পই আজ আমি তোমাদের বলবো।

সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন আমি কয়লা-কুঠিতে থাকতাম। সেই সময় এক ভদ্রলোককে দেখেছিলাম, কারও সঙ্গে দেখা হ'লেই তৎক্ষণাৎ তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করে' বসতেন, 'আজ কত তারিখ হ'লো বলতে পারেন ?'

আমার সঙ্গে উপ্‌রি-উপ্‌রি তিনদিন তাঁর সঙ্গে দেখা। তিনদিনই দেখলাম তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—ঠিক সেই এক কথা।

আবার শুধু বাংলা মাসের তারিখ বললে চলবে না। ইংরেজি মাসের তারিখটাও চাই !

পথে যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই তিনি তারিখের কথা জিজ্ঞাসা করেন। এমনি করে' সারাদিন ধরে তাঁর সেই তারিখ জিজ্ঞাসা চলতে থাকে।

অথচ আশ্চর্য্য, তিনি উন্মাদ ন'ন।

এই ত' হলো একজন।

আর-একজনকে জানতাম। তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, 'ক'টা বাজলো বলতে পারেন স্যার?'

দু'জনেই প্রায় এক রকম।

আর-একজন ছিলেন, বয়স তাঁর বেশি নয়, কোথায় কোন আপিসে চাকরি করতেন, বন্ধু-বান্ধব পরিচিত অপরিচিত যার সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ ঘটে, তাকেই জিজ্ঞাসা করে' বসেন, 'দেখুন ত' মশাই, আমার চেহারাটা আজ একটু শুক্‌নো শুক্‌নো মনে হচ্ছে কি না!'

কেউ হয়ত' বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, শুক্‌নো একটুখানি মনে হচ্ছে।'

তখনি তিনি বলে' বসলেন, 'আচ্ছা, কেন বলুন ত?'

সর্ব্বনাশ!

কেন তিনি শুক্‌নো হয়েছেন তাও বলতে হবে।

যদি বলেন, 'কই না, শুক্‌নো ত' মনে হচ্ছে না!'

বাস্, তক্ষুনি তিনি রেগে উঠলেন।—শুক্‌নো মনে হচ্ছে না? কি রকম চোখ মশাই আপনার?'

আবার কেউ যখন তাঁর কাছে থাকে না, তখন তিনি তাঁর পকেট

থেকে ছোট্ট একটি আর্শী বের করেন। তারপর সেই আর্শীটি নিয়ে নিজের মুখখানা তিনি নিজেই বার-বার দেখতে থাকেন।

মুখ দেখা শেষ হ'লে বাঁ-হাত দিয়ে নিজের ডান-হাতের কব্জিটা চেপে ধ'রে চোখ বুজে এক মনে তিনি তাঁর নিজেরই নাড়ী পরীক্ষা করেন।

সর্ব্বদাই সন্দেহ, তাঁর জ্বর হয়েছে। ভেতরে ভেতরে গুস্‌গুসে জ্বর, বাইরে কেউ টের পায় না, তাই বোধ হয় চেহারাটা তাঁর দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে।

আর-এক ভদ্রলোককে দেখেছি, জীবনে তাঁর একমাত্র সখ—দেশালাইএর খালি বাক্স সংগ্রহ করা। দিনের কাজ শেষ করে' সন্ধ্যেয় যখন তিনি বাড়ী ফেরেন, দেখা যায়, দেশালাইএর বাক্সে তাঁর পকেট দুটি বোঝাই। দেশালাইএর খালি বাক্স রাখবার জন্যে বাড়ীতে একটা নতুন তাক্ তৈরি করতে হয়েছে। বন্ধু-বান্ধব কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনি তাঁকে বাড়ীর ভেতর ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেন, 'এই ছাখো!'

বাস্, পর্ব্বতপ্রমাণ খালি দেশালাইএর বাক্সগুলি তাঁর দেখিয়েই আনন্দ!

জঞ্জালের এই গাদা সঞ্চয় করে' শেষ পর্য্যন্ত কি যে তাঁর হবে তা তিনি নিজেও জানেন না।

এই নিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি হ'লে তাঁর স্ত্রী বলেন, 'মরবার পর ওই দিয়ে আমার চিতে সাজানো হবে।'

এ রকম ধরতে গেলে কত রকমের কত জীব যে এই পৃথিবীতে বিরাজ করছেন তার আর অন্ত নেই।

সেদিন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার ট্রেনে দেখা। এইবার তাঁর কথা বলি।

হাওড়া থেকে ট্রেনে চড়েছি। যাব—মধুপুর। ইণ্টার ক্লাসের টিকিট। কামরায় লোকজনের ভিড় এক রকম নেই বললেই হয়। কামরার ও-দিকে দু'জন ভদ্রলোক শুয়ে পড়েছেন, আর এ-দিকে জানলার কাছে আমি চুপ করে' বসে আছি।

ট্রেনে যখন উঠেছিলাম, সন্ধ্যা তখনও হয়নি। জানলার কাছটিতে বসে বসে দেখলাম—দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের ওপর ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামলো! অন্ধকারের একটা আবছা আবরণে সব-কিছু ঢাকা পড়ে গেল। চোখের সুমুখ থেকে পথ-ঘাট অদৃশ্য হলো, জানলার বাইরে অস্পষ্ট গাছগুলোর ওপর অজস্র জোনাকী পোকা ছাড়া আর কিছুই ভাল দেখা গেল না।

গাড়ী আমাদের ধীরে ধীরে ছোট্ট একটি ষ্টেশনে এসে দাঁড়ালো। আমাদের কামরায় লোকজন এতক্ষণ কেউ ওঠেনি, এবার একজন উঠলেন। দেখলাম, চামড়ার একটি সুট-কেস্

হাতে নিয়ে বর্ম্মা চুরুট টানতে টানতে চশ্‌মা-পরা এক ভদ্রলোক

দরজা ঠেলে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। হাত থেকে স্যুট-]

কেস্‌টি নামালেন, চোখ থেকে চশমাটি খুললেন, তারপর আমার পাশে বসে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। ভারি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছি, এমন সময় ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কোন্ ষ্টেশন মশাই ?'

আচ্ছা মজার লোক ত' !

বললাম, 'আপনি ত' এই খানেই ট্রেনে উঠলেন, জানেন না কোন্ ষ্টেশন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আর বলতে হবে না।' বলেই তিনি তাঁর হাতের চুরুটটা টানতে লাগলেন।

গাড়ী তখন ছেড়ে দিয়েছে।

গাড়ীতে বসে অবধি লক্ষ্য করলাম—ভদ্রলোক ছট্‌ফট্‌ করুছেন। কি যে বলবেন, কি যে করবেন, কিছুই যেন বুঝতে পারছেন না। বেঞ্চের ওপর স্যুট্‌-কেস্‌টি নামিয়ে রেখে তিনি একবার উঠছিলেন, একবার বসছিলেন, একবার এ-পাশ ফিরছিলেন, একবার ও-পাশ ফিরছিলেন—কিছুতেই যেন তাঁর স্বস্তি নেই। তাকিয়ে দেখলাম—মাথার চুলগুলো তাঁর উস্কো-খুস্কো ; জামা গায়ে দিয়েছেন, কিন্তু একটা বোতামও তার ঠিক জায়গায় লাগানো নেই।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় যাবেন আপনি ?'

ভদ্রলোক সেই যে গাড়ীতে উঠেই চশমাটা তাঁর চোখ থেকে খুলে হাতে রেখেছিলেন, এখনও সেটি তাঁর হাতেই রয়েছে। চুরুট এবং চশমা এক হাতে ধরেই তিনি এক মনে চুরুট টানতে লাগলেন, আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না।

ভাবলাম হয়ত' শুনতে পাননি। তাই আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'মশাইএর নামটি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?'

এবার তিনি কথা বললেন। বললেন, 'কেন ? আমাকে আপনার চেনা-চেনা মনে হচ্ছে নাকি ? তা হবে। আমি অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়াই মশাই, বাংলা দেশের বহু বড় বড় লোকের সঙ্গে আমার পরিচয়। তা হবে, হয়ত' কোথাও দেখে থাকবেন।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার নাম ?'

'হ্যাঁ, নাম বললেও চিনতে পারেন। নাম আমার—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম-এ বেদান্তরত্ন। আমার বড় ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, মেজ মুন্সেফ্, আর ছোটটি ডাক্তার।'

এই বলে, তিনি আবার তাঁর চুরুটে টান দিলেন।

ভাবলাম, অতিরিক্ত পড়ে পড়ে লোকটার বোধ হয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বললাম, 'আপনি নিজে বুঝি বাড়ীতেই থাকেন ?'

'বাড়ীতে থাকবো কি রকম ?' বলে' যে-রকম মুখ-চোখের ভাব করে' তিনি আমার মুখের পানে তাকালেন, ভাবলাম হয়ত' মেরেই বসবেন। কি অন্যায় যে করেছি বুঝতে পারলাম না। চুপ করে একটুখানি সরে গেলাম।

তিনি আবার বললেন, 'ফট্ করে' ও-রকম কথা যাকে-তাকে বলবেন না মশাই, ডিফেমেশান্ কেশ করে' দেবে তা জানেন ? আমি কি বেতো-রুগী, যে বাড়ীতে বসে থাকব ? বাড়ীতে আমি কখ্খনো বসে থাকি না, আমি ঘুরে বেড়াই। হরদম্ ঘুরে' বেড়াই।'

কথা তখনও তাঁর শেষ হয়নি। একটুখানি থেমে আবার আর-একবার চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'আমার জমিদারী আছে মশাই, কলিয়ারী আছে, বিষয়-সম্পত্তি আমার নিজেরও আছে, ছেলেরাও অনেক করেছে। সে-সব দেখা-শোনার ভার আমার নাতির ওপর। আমার মেয়ের ছেলে। শ্রীমান শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় বি-এল। আমার তিন ছেলে আমায় কত দেয় জানেন ? প্রত্যেকে একশ' করে মাসে। বাস্, তিনশ' টাকা। সেই টাকা নিয়ে আমি দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াই। বাড়ীতে বসে থাকা আমার স্বভাব নয়। বসে থাকে কারা ? যারা আল্সে কুঁড়ে, যারা খেতে পায় না, যারা বেতো-রুগী, যারা ডিস্পেপ্টিক্, যারা—এই যা ! করলাম কি মশাই ?'

কি করেছেন প্রথমে কিছুই বুঝতে পারিনি। পরে বুঝলাম, কথা বলবার ফাঁকে কাণ্ড তিনি একটা সত্যিই করে' বসেছেন। তাঁর হাতে ছিল চুরুট আর চশমা। জানলার বাইরে হাত বাড়িয়ে চুরুটের ছাই ফেলতে গিয়ে ছাই না ফেলে তিনি চশমাটাই দিয়েছেন ফেলে।

'চশমাটা আর পাওয়া যাবে না, কি বলেন? বাই-ফোকাল্ চশমা মশাই, অনেক দাম। এই সেদিন কিনেছি কলকাতায়। কিন্তু দেখুন, এটি গেল শুধু আপনার জন্যে। আপনি ভয়ানক লোক মশাই, ওই যে চুপ করে' বসে আছেন—মিট্‌মিটে শয়তান! আমার নাম কি, কোথায় বাড়ী, কি সমাচার—এ-সব জানবার কী দরকার আপনার ছিল বলুন ত? আমি যে-ই হই না, তাতে আপনার কি? মাঝখান থেকে আমার দামী চশমাটা গেল। হাসবেন না মশাই, আমার রাগ ভারি খারাপ, ফট্ করে' এক্ষুনি হয়ত একটা চড় মেরে বসবো, ভয়ানক কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে। হাসতে লজ্জা করে না? আমার একটা জিনিষ গেল, আর আপনি দিব্যি বসে বসে হাসছেন? ছি, ছি, এ-গাড়ীতে ওঠাই আমার উচিত হয়নি। আমি নেমে যাচ্ছি।'

এই বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। জুতো পরলেন, দেখলাম—বাঁ-পায়েরটা ডান্ পায়ে, আর ডান্-পায়েরটা বাঁ-পায়ে।

সর্ব্বনাশ! লোকটার কথা শুনে কার না হাসি পায়? তাও

অতি সাবধানে মুখ টিপে একটুখানি হেসেছিলাম মাত্র। দাঁতে দাঁত চেপেও সামলাতে পারিনি।

যাক্, এ উন্মাদটা নেবে গেলেই বাঁচি। বিশ্বাস কি, হয়ত' মেরে বসতেও পারে। কিন্তু গাড়ী তখনও চলছিল।

নামবার উপায় নেই। আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বেদান্তরত্ন-মশাই এ-দিক ও-দিক একটুখানি পায়চারি করেই আবার আমার পাশে এসে বসলেন। আমি জানলার দিকে মুখ ফেরালাম।

'নিন্, সিগ্রেট্ খান নলিনীবাবু।'

আচ্ছা মানুষ ত! নলিনী আমার নাম নয়। নাম তিনি আমায় জিজ্ঞাসাও করেন নি। অথচ কথাটা যে আমাকেই বলা হচ্ছে তাও বুঝলাম। বললেন, 'আমি লোক খুব ভাল মশাই, তা জানেন? আমার রাগ যেমন ঝট্ করে' বেড়ে ওঠে, আবার তেমনি চট্ করে' পড়েও যায়। যাক্‌গে, একটা চশমা ত! অমন আমার অনেক গেছে। নিন্, সিগ্রেট্ একটা খান্। চুরুট্ আপনি টানতে পারবেন না।'

কি আর করি, হাত বাড়িয়ে নিতে গেলাম। কিন্তু তাকিয়ে দেখি, কোথায় সিগারেট? রিংএ গাঁথা এক থোকা চাবি তিনি পকেট থেকে বের করে' আমার সুমুখে ধরেছেন। বললাম, 'এ কি রহস্য করছেন নাকি? কোথায় সিগ্রেট?'

'এই ত!' বলে তিনিও তাঁর হাতের দিকে তাকালেন। তাকিয়ে বোধকরি একটুখানি লজ্জিত হয়ে গেলেন। বললেন, 'ও! ভুল হয়ে গেছে। দাঁড়ান্।'

· চাবিগুলো পকেটে রেখে এবার তিনি সত্যি-সত্যিই সিগারেট বের করলেন। ঝকঝকে' চাঁদি-রূপোর সিগারেট-কেস্। একটি সিগারেট নিয়ে ধরালাম। তিনিও একটি ধরালেন।

বললেন, 'ফাইভ্-ফিফ্‌টি-ফাইভ্! কম-দামী সিগ্রেট আমি খাই না। কিন্তু চশমাটা আমার গেল, কি বলেন? আর পাবার কোনও উপায় নেই। তবে গেল শুধু আপনার জন্যেই। তা যাক্।'

বার-কতক্ খুব জোরে-জোরে সিগ্রেট টেনে খুব খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে তিনি আমার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। ভাবলাম—আবার হয়ত' তিনি পাগলামি সুরু করবেন। আবার আমি জানলার কাছে একটুখানি সরে বসলাম।

তিনি বললেন, 'সিগ্রেট অমন আস্তে-আস্তে টানলে মজা হয় না, জোরে-জোরে টানুন। আপনার ছেলেপুলে আছে ত' নলিনীবাবু?'

বললাম, 'আমার নাম নলিনীবাবু আপনাকে কে বললে? নলিনী আমার নাম নয়।'

'বা-রে! আপনিই ত' বললেন।'

'না আমি বলিনি।'

'নিশ্চয় বলেছেন। না বললে আমি জানলাম কেমন করে' ?'

পাগলের সঙ্গে বকে লাভ নেই। কথায় কথায় কথা বাড়বে, কাজেই চুপ করে' রইলাম।

কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই। আমার গায়ে একটা খোঁচা দিয়ে বললেন, 'বলি ও মশাই, আমাকে মিথ্যাবাদী বানিয়ে চুপ করে' বসে রইলেন যে বড় ?'

বললাম, 'আপনার মাথার ঠিক নেই। চুপ করুন।'

'কি বললেন ? মাথার ঠিক নেই ? তার মানেই আমাকে পাগল বলা হ'লো, কেমন-?'

বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি উন্মাদ।'

'ও! ফাইভ্-ফিফ্‌টি-ফাইভ্ সিগ্রেট্ খাওয়ালাম কি-না! চশমাটা দিলেন জাহান্নামে, তার ওপর পাগল বলে' গালাগালি দিলেন! জানেন, আপনার নামে আমি 'কেশ্' করতে পারি!'

হেসে বললাম, 'সেই ভালো।'

'আবার হাসছেন ?'

আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়েছি যা-হোক্। চুপ করে' রইলাম।

ছোট্ট একটি ষ্টেশনে গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছিল। লোকজন কেউ উঠলো না। গাড়ী দিলে ছেড়ে।

পকেট থেকে আবার একটা সিগ্রেট বের ক'রে তিনি মুখে দিলেন। তারপর দেশলাইএর জন্যে এ-পকেট সে-পকেট হাতড়াতে লাগলেন। কোথাও না পেয়ে শেষে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'দিন, আমার দেশলাই আপনি পকেটে পুরেছেন, দিন।'

দেশলাইএর বাক্স তাঁর পাশেই নামানো ছিল। আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলাম।

'এক্স্‌কিউজ্‌ মিই স্যার্‌!' বলে সিগারেটটা ধরিয়েই তিনি আবার তাঁর পকেট থেকে সিগ্রেটের বাক্সটা বের করে' আমার হাতের কাছে তুলে ধরলেন। বললেন, 'রাগ আমার পড়ে গেছে।—নিন্‌, আর-একটা সিগ্রেট খান নলিনীবাবু।'

ঘাড় নেড়ে বললাম, 'না।'

খাবার জন্যে হয়ত' তিনি আবার পীড়াপীড়ি করতেন, কিন্তু ভগবান বাঁচালেন। জানলার বাইরে সিগ্রেটের ছাই ফেলতে গিয়ে হঠাৎ তিনি লাফিয়ে উঠলেন।—'ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে? দেখলেন? দেখলেন—আপনি আমার কি সর্ব্বনাশ করলেন? ফর্‌ ওন্‌লি-সিগারেট! আমাকে এই ষ্টেশনে নামতে হতো, আর ট্রেনটা এরই মধ্যে দিলে ছেড়ে!—অল্‌ রাইট্‌! আমি চেন্‌ টানবো। দেখি—কেমন করে' না দাঁড়ায়!'

চেন্ টানবার জন্যে বোধকরি তিনি উঠে যাচ্ছিলেন

আমি তাঁর হাতে ধরে' জোর করে' টেনে বসালাম। বললাম,

মিছিমিছি পঞ্চাশটা টাকা জরিমানা কেন দেবেন মশাই, বলুন।'

কিন্তু সেজন্যে নয়। উনপঞ্চাশ বায়ু যখন তাঁর এত প্রবল, চেন্ হয়ত' তিনি টানতেন, গাড়ীও দাঁড়াতো, নিজে জমিদার, তিন ছেলে বড়লোক, পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হয়ত' তাঁর কাছে কিছুই নয়। কিন্তু কাম্‌রার দু'জন যাত্রী তখন প্রগাঢ় নিদ্রায় অচেতন, আমাকেই হয়ত' সাক্ষী দেবার জন্যে টানাটানি করবে, কি জানি বাবা, রেল-কোম্পানির হাঙ্গামা পোয়াবার মত অবসর আমার নেই, কাজেই হাতে ধরে' জোর করে' তাঁকে টেনে বসালাম।

আমি তাঁকে টেনে বসালাম, তিনিও আমাকে কম টানাটানি করলেন না। যতক্ষণ না পরের ষ্টেশনে গিয়ে গাড়ী থামলো ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি আমাকে এই বলে' তিরস্কার করতে লাগলেন যে, অতি কুক্ষণে আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে এবং শুধু সেই জন্যেই পরের পর এতগুলো বিপদ তাঁর মাথার ওপর দিয়ে পার হয়ে গেল।

আমি আর কোনও কথাতেই কান দিলাম না। অন্য-মনস্কতার ভান করে' পাশ ফিরে বসে রইলাম।

ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াতেই সুট্-কেস্‌টি হাতে নিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে তিনি নেমে গেলেন। আমিও হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলাম।

গাড়ী ছাড়তেই ভাবলাম, এইবার হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ি। বাক্সের ওপর আমার বিছানা ও বালিশ ছিল। আনতে গিয়ে দেখি, সর্ব্বনাশ! মনের ভুলে আমার স্যুট-কেস্‌টি নিয়ে বেদান্তরত্ন-মশাই নেমে গেছেন।

ভাগ্য ভাল যে, স্যুট-কেসে টাকাকড়ি কিছু রাখিনি। কয়েকখানা ধোয়া কাপড়-জামা, আর্শী, চিরুণী ও একখানি সাবান ছাড়া তাতে আর বিশেষ কিছু ছিল না।

মধুপুরের বাসায় পৌঁছে প্রথমেই ভাবলাম, বেদান্তরত্ন-মশাইএর স্যুট-কেসের মধ্যে কি আছে দেখা যাক্। খানকতক ধুতি যদি থাকে, আর কিন্‌তে হয় না। চাবি দিয়ে খোলবার প্রয়োজন হলো না। দেখলাম, খোলাই আছে। প্রথমেই নজরে পড়লো—পাঁচটি ফাইভ্-ফিফ্‌টি-ফাইভ সিগ্রেটের টিন, চিঠি লিখবার প্যাড্ একখানি, এক প্যাকেট সাদা খাম, দশ খানি পোষ্টকার্ড, একখানি ইংরেজি নভেল, কাগজে-জড়ানো একটি কোষ্ঠী, রুমালে জড়ানো ছোট একটি কাঁচের গ্লাস, আর এক শিশি ওষুধ।

ভাবলাম তাঁর দামী সিগ্রেট একটা খাওয়া যাক্। একটি টিন খুলে দেখি—তাতে সিগ্রেট নেই, সিগ্রেটের বদলে রয়েছে—গোল করে' পাকানো এক তাড়া নোট। বুকের ভেতরটা কেমন যেন করতে লাগলো। হাত দুটো তখন আমার থর্ থর্ করে'

কাঁপছে। বাকি চারটে টিন খুলতে গিয়ে দেখলাম, একটি টিনের মধ্যে কয়েকটি সিগ্রেট রয়েছে, আর বাকি তিনটি টিন তেমনি দশ টাকার নোটে ঠাসা।

সে নোটগুলো আমি খরচ করিনি। এখনও আমার কাছেই রয়েছে। তোমাদের সঙ্গে বেদান্তরত্ন-মশাইএর যদি কোনোদিন দেখা হয় ত' তাঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

জেনে রাখা ভালো,

কারণ—এ-দেশে এই প্রথম !

ছেলেদের মনের ঝোঁক কোন একটা দিকে বাড়াতে, কন্টিনেন্টের নানাদেশে—বিশেষতঃ নব্য রুশ্ কত ফিকিরই না কচ্চে! হরেক রকম প্রাইজ—'হাওয়া-গাড়ী' থেকে 'কাগজের কেল্লা' মাথাওয়ালা ছেলেদের দেওয়া হয়। 'ক্রস্-ওয়ার্ড' 'পাজল্' এমন কি নতুন বইয়ের সবচেয়ে বেশী ক্রেতাকেও পুরস্কৃত করা হয়। আমরা তাই মনে করেচি—এদেশে দেখি চেষ্টা করে যদি কোন উপকারে আসে আমাদের শিশু-ক্রেতাদের—প্রাইজ্-সিষ্টেম্ খুলে। যে-কোন ছেলেমেয়ে আমাদেব প্রকাশিত যে-কোন বইয়ের পঁচিশখানা কুপন আমাদের অফিসে পাঠিয়ে দেবে তাকে একটি ভাল "তরুণ-ঝরণা-কলম" (Fountain Pen) দেওয়া হবে। কুপন প্রতি বইয়ের শেষ পাতায় থাকবে।

তরুণের দিন-পঞ্জী

তোমাদের তরুণ-মনে যা-কিছু টুকে রাখবার
মতো ওঠে—খুঁটিনাটি—প্রমিস্—এন্‌গেজ্‌মেণ্ট
(থাক্‌তেও তো পারে, হাস্‌চো যে ?)
পরের ক'পাতায় লিখে
রাখ্‌তে পারো।

যুগে-যুগে চিরন্তন সত্য—সাহিত্য!

জীবন-যুদ্ধে জয়ী হয়ে আজ প্রাতঃস্মরণীয় হয়েছেন যাঁরা, তাঁদের প্রত্যেকেই একদিন গড়ে উঠেছিলেন এই সাহিত্যের ভেতর দিয়ে। এতদিন ঠাকুরমার মুখের গল্পের ভেতর দিয়ে কল্পলোকে লুকিয়েছিল যে সাহিত্য—যুগ-যুগান্তের পর বাংলার খোকা-খুকু আর তরুণদের সাদর-আহ্বানে সেই শিশু-সাহিত্য নেমে এসেছে এবার সারস্বত-মন্দিরের সিংহদ্বারে! জীবনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের এই প্রথম প্রবেশ-পথে যেতে চাও যারা, এগিয়ে এস'।

প'ড়ে মানুষ হবার মতো—সাংসারিক-জীবনে কাজে-লাগার উপযোগী কয়েকখানি জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিশুগ্রন্থ—

হানাবাড়ী—শ্রীসুকুমার দে সরকার

পেস্তার বরফি—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কুবের-পুরীর রহস্য—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

দুর্গম জঙ্গলে—শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল

অচিন পথে—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বড়ো-ভালো-লাগে—শ্রীব্রজমোহন দাশ

এই বই ক'খানি বাংলার সমস্ত বইয়ের দোকানেই পাবে।

তরুণ-সাহিত্য-মন্দির—৫৯, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

‘পেস্তার বরফি’র পরেই প্রকাশিত হবে,

বাংলার একডাকে-চেনা কথা-শিল্পী

“যকের ধন” ও “আবার যকের ধনে”র

সেই বিখ্যাত বাঙালী যুবক

বিমল ও কুমারের

নূতন কীর্ত্তিকাহিনী!

রত্ন-শিকারের ভীষণ বিপজ্জনক ইতিহাস!

লেখাটি আগাগোড়া নূতন, ইতিপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

দাম ১৲ এক টাকা, ডাকব্যয় ।৵০

মোট ১।৵০ মণিঅর্ডার করে পাঠালে ঘরে বসেই বই পাবে।

তরুণ-সাহিত্য-মন্দির—৫৯, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীসুকুমার দে সরকারের লেখা

যে বইখানি 'তরুণ-সাহিত্য-মন্দির' থেকে প্রথম
প্রকাশিত হয়েছে তা'র নাম—

সব দিক দিয়ে এই বইখানির এমন একটা লোভনীয় আকর্ষণ আছে যা' না দেখে, কেবল বিজ্ঞাপন প'ড়ে অনুমানই করা একেবারেই অসম্ভব! ছোট, বড় প্রত্যেকের সুখপাঠ্য এই উপহারের বইখানি এখনো যদি না কিনে থাকো—যে কোন বইয়ের দোকানে গিয়ে অন্ততঃ একবার দেখে এসো!

দু'টাকার উপযুক্ত এই বইখানির

দাম মাত্র ৸৹ বারো আনা, মাঃ ।৶৹

মোট ১৶৹ মণিঅর্ডার করে পাঠালে ঘরে বসেই বই পাবে।

তরুণ-সাহিত্য-মন্দির—৫৯, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—মনোরথে ভূ-পর্য্যটক মনিষী—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

বাস্তব-অভিজ্ঞতার চরম বিবৃতি—

অচিন পথে

হাঁটা-পথে, মোটরে, ট্রেনে, এরোপ্লেনে, তারও বাইরে দূরে—বহুদূরে—দূর দিগন্তের বনরেখার ওপারে, সাগর-পারে, পাহাড়ের শেষে—আর কোথায় যাবে? আছে! আছে! এমন দুরধিগম্য অচিন পথের গোপনতত্ত্ব সৌরীন্দ্রমোহনবাবুর খাতার পাতায় টোকা আছে, যার রহস্য ছাপার অক্ষরে বইয়ের পাতায় প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা ধারণায়ও আনতে পারবেনা।'

বহু চেষ্টার ফল এই বহু ছবিভরা বইখানি একবার পড়ে দেখো।

দাম—বারো আনা।

—বহুখ্যাত সাহিত্যিক—

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পালের

দুর্গম জঙ্গলে

এই বইখানির 'ছবি-বিভ্রাট' ঘটেছে!

মানে—ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে ছবি তৈরি করতে গিয়ে সব ছবিগুলিই এমন বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছে যে, বইয়ে বোধহয় আলাদা করে ছেপে দিতে হবে—

'অল্পবয়সের শিশুদের গভীর-রাতে এই বইখানি পড়া বা এই বইয়ের ছবি দেখা একেবারে নিষিদ্ধ!'

দাম—বারো আনা।

যিনি পড়বেন তাঁকেই বলতে হবে—

'আহরিকা-সম্পাদক

ব্রজমোহন দাশের লেখা

বড়ো-ভালো-লাগে

বইখানি বড়ো ভালো লাগে গো, বড়ো ভালো লাগে।

কত মিষ্টি এই বইখানির নাম! যেন

ভাবে ঢল-ঢল মধু-ঢালা!'

না-হবে কেন? ঃ, এযে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের চিন্তাধারা একত্রিভূত কোরে কলমের মুখে ঢেলে-দেওয়া ব্রজমোহনবাবুর আঁতের জিনিষ! ব্যয় অমিত —দাম আশাতীত কম—ছাপা হোচ্চে।

—ছবির সংখ্যা?—

সে এত অতিরিক্ত যে এখন শুনলে তোমরা হেসেই উড়িয়ে দেবে!

দাম—বারো আনা।

তরুণ-সাহিত্য-মন্দির—৫৯, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।